দেবতা যদি এই মুহূর্ত্তটিকে অনাদি অনন্ত করিয়া সৃষ্টি করিতেন! ...

তাহার পর বিদায়ের পালা; চোখের কোণে অশ্রু-উৎস জাগিয়া উঠিত, এই ঠোঁট দুটিতে বাবু, এই ঠোঁট দুটিতে বিশ্বের তৃষ্ণা জাগাইয়া দিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইত! রাঙা ঠোঁট দুটি তার আমিও ঠিক তেমনি আবেগে ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিতাম। সে তৃষ্ণা যেন মরে না, অক্ষয় হইয়া ঠোঁটের কোণেই জাগিয়া থাকে!

পূর্ণ যৌবনের ডালি দিয়া এমনি করিয়া দুইটি বৎসর কাটাইলাম। এই দেহ এই রূপ নিঃশেষে তাহার পায়ে বিসর্জ্জন দিয়া মনে প্রাণে তাহাকেই স্বামী বলিয়া মানিয়া লইলাম, পত্নীত্বের অধিকার সে ও আমায় দিয়াছিল বাবু, কিন্তু যে বিধাতার চোখ দুইটা মানুষের সুখে অসহ্য বেদনায় টাটাইয়া উঠে, একদিন তাহার দৃষ্টি অকস্মাৎ আমার দিকেই পড়িয়া গেল—আমার কপাল ভাঙিল।

জোয়ানের দেশ হইতে তার আসিল তাহার বুড়া বাপের অসুখ; কত বলিলাম কত বুঝাইলাম, যাইতে সে চাহে না,—দুই হাতে আমাকে সে জড়াইয়া আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল আমায় ছাড়িয়া সে এক দিনও বাঁচিবে না, আমাকে তাহার চাই, চাই, চাই!

চোখের আড়াল করিতে মন কি আমারই চাহিয়াছিল, বাবু? কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে তাহাকে ত উপেক্ষা করিতে পারি না! চোখের জলে তাহাকে একরূপ জোর করিয়াই পাঠাইয়া দিলাম, এই ঠোঁট দুটার উপর শেষ বিদায়ের চিহ্ন আঁকিয়া সে চলিয়া গেল! ...

রূপসীর চোখ দুইটার কোণে মুক্তার মত দুই ফোঁটা জল সেই অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম, তারপর? আঁচল দিয়া জলটা মুছিয়া ফেলিয়া সে আবার বলিতে সুরু করিল,—

একমাস কাটিল, দুইমাস কাটিল, জোয়ানের আর কোন খবরই আসিল না; প্রায় মাস তিনেক পরে একদিন একটা লোক আসিয়া বলিল জোয়ান্ শীঘ্রই আসিবে, তবে একাকী নহে, তাহার পিতা ও স্ত্রীকে লইয়া!

জোয়ানের স্ত্রী? তবে কি—কথাটা সেদিন আদৌ বিশ্বাস করিলাম না। যাহারা খবর দিল তাহারা বার বার আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সহিত একটা কুলীর মেয়ের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না, কিছুতেই না। ...

চমক ভাঙিল, মনে সন্দেহ জাগিল, রাতের আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া সেদিন যে সত্যকার সম্বন্ধ আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, মানুষের চোখে তাহার কি সবটুকুই মিথ্যা? ...

সতই হোক বা মিথ্যাই হোক, সে বিচার করিবার মত ক্ষমতা আমার মস্তিষ্ক হইতে লোপ পাইয়াছিল। চিন্তার তাড়নায় চোখের ঘুম বিদায় লইল, ক্ষুধা লোপ পাইল, কোনরূপে মরিয়াও বাঁচিয়া রহিলাম।

জোয়ান্ ফিরিল—সেদিন কানকে অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, যাহারা খবর দিয়াছিল তাহাদেরও অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু নিজের চোখ দুইটাকে আজ আর কোন প্রকারেই অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। জোয়ান্‌কে দেখিলাম,—তাহার স্ত্রীকেও।

তাহার পর কত চেষ্টা করিতে লাগিলাম একবার জোয়ানের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। যে চোখে তাহার একদিন আমারই রূপতৃষ্ণা জাগিয়া থাকিত আজ সে চোখ তাহার আমার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাইতেও পারে না, যে মুখে তাহার আনন্দের অভাব কখনো দেখি নাই, আজ বিষাদে ব্যথায় তাহা ভরিয়া উঠিয়াছে, সারা চোখে-মুখে যেন কী এক অসীম অতৃপ্তি। ...

দেখা একদিন হইল,—সেই ঝিলের ধারেই, আমি বসিয়া ছিলাম, পেছন হইতে সে আসিয়া ডাকিল, রূপসী!

বিস্মিত সে দিন কম হই নাই বাবু—যাহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে যে স্বেচ্ছায় আমার চোখের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে এত বড় সত্যটা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই।

মুখ ফিরাইয়া একটু উদাসভাবেই বলিলাম, কিছু বলিতেছিস্ আমায়?

জোয়ান্ আসিয়া হাত দুইটা আমার চাপিয়া ধরিল, কাতরভাবে বলিল, বলিবার আজ কিছুই নাই। রূপসী, আজ একটা ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।…

সে ভিক্ষা কি, তাহাও সে বলিল, সঙ্গে টাকাও কিছু আনিয়াছিল, আমার হাতে দিয়া বলিল, তোর ভালবাসাকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাস্ তবে আজই তুই এখান হইতে চলিয়া যা রূপসী, আমাকে বাঁচিতে দে,—

বাকী কথাগুলা বোধ করি তাহার কণ্ঠেই মিলাইয়া গেল, ধীরে ধীরে সে মাথা নীচু করিল।

বুঝিলাম, আমার প্রয়োজন তাহার ইহজগতে শেষ হইয়াছে। এখন আমার জীবন-মরণে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই,—কেবলমাত্র তাহার সুখের পথে কাঁটা না হইয়া থাকি এইটুকুই তাহার সকরুণ মিনতি! তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইলাম,—মনে মনে বলিলাম, তাই ভাল প্রিয়তম, তাই ভাল। তোমাকে ভাল বাসিবার অধিকার দিয়াছ সে-ই ঢের, ইহার বেশী আর কিছু চাহি না।…

যে ঝিলের তীরে দাঁড়াইয়া একদিন মিলনের প্রথম বাসর পাতিয়াছিলাম আজ সেইখানেই বিচ্ছেদের যবনিকা টানিয়া দিয়া আসিলাম।

ঘরে ফিরিলাম বটে কিন্তু মন টিকিতে চাহিল না। রাত্রি হইল, মন্ত্রমুগ্ধের মত জোয়ানের বাড়ীর কাছে কখন্ কেমন করিয়া যে আসিয়া পড়িলাম মনে নাই। জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, জোয়ান্ অকাতরে ঘুমাইতেছে, তাহার বুকের উপর আর একখানি মুখ তেমনি নিশ্চিন্তে পরম পরিতৃপ্তির সহিত মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

চোখ দুইটা আমার জ্বালা করিয়া উঠিল, মনে পড়িল, একদিন ওই বুকে এমনি করিয়া আমিও ঘুমাইয়াছি, … ওই ঠোঁট দুইটার উষ্ণ-স্পর্শ একদিন আমিও আমার এই ঠোঁট দুইটা পাতিয়া লইয়াছি।

আবার মনে পড়িল, জোয়ানের কাতর প্রার্থনাটুকু তাহার মুখের ব্যাকুলতাটুকু! মনে মনে বলিলাম ঘুমাও প্রিয়তম, ঘুমাও, তোমার সুখের পথের কাঁটা হইয়া বাঁচিবার কামনা নাই,—যে কুলীর মেয়ে মনে প্রাণে তোমায় ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় কাঙালিনী সাজিয়াছে, সে আজ নিঃস্ব হইয়াই বিদায় লইতেছে।…

তাহার পর ছুটিয়া আসিলাম, এই রেল-লাইনের ধারে … ঠিক এমনি সময়ে এমনি অন্ধকারে।…

রূপসী হঠাৎ চুপ করিল।

বলিলাম, তারপর? …

সাড়া নাই শব্দ নাই চেঁচাইয়া উঠিলাম, রূপসী! …

* * *

ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল, চোখ মেলিয়া দেখিলাম, দিনের আলোয় ঘর ভরিয়া গেছে। চলন্ত গাড়ীর নাড়া পাইয়া হাত-বাতীটাও কখন্ নিঃশব্দেই নিভিয়া গেছে।…

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(১২)

জয়পুরের আড্ডায় এসে প্রকাশকে দেখে কনক ও হেমদাসের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তারা যখন জানতে পারলে যে, সে কেমন ক'রে এখানে এসে পড়েছে, কনক নিঃসাড়ে এক সময় বেরিয়ে গিয়ে চুপি চুপি প্রকাশের বাপকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে চ'লে এল।

শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুদ্বয়ের শুভাগমনকে স্মরণীয় করে তোলবার জন্য পরের দিন সন্ধ্যা থেকেই 'কিং এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হোটেলের' সব চেয়ে বড় ঘরখানিতে একটি মস্ত আসর বসেছিল। হাসি গল্প আমোদ প্রমোদ এবং সুরা ও সঙ্গীতের স্রোতে হোটেলের সে ঘর যেন সেদিন মর্ত্ত্য-লোকে ইন্দ্রসভা হয়ে উঠেছিল।

আজকের আসরে অভিনেত্রীরাও উপস্থিত ছিল। তাদের উপর ভার পড়েছিল গান পরিবেশনের। কুসুম, কুমুদ, বিনি সকলে মিলে তখন একসঙ্গে কোরাস্ গাইছিল—

"এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
যারে ভাল বেসেছি!—"

কনক ও হেমদাস জয়পুরে আসাতে প্রকাশের সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত্তি হয়েছিল। কারণ, এতদিন সে যেন এদের মধ্যে থেকেও নিতান্ত একলাটি ছিল, এইবার তার দলের আর দু'জন এসেছে বলে তার অনেকখানি ভরসা বেড়েছিল। কিন্তু সেদিন রাত্রে সে যা দেখল তাতে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা এসে যে এদের সঙ্গে এমন ভাবে দলে ভিড়ে যাবে এটা সে মোটেই আশা করে নি। হেম আর কনকও যে মদ খায় প্রকাশ সে খবরও জানতো না, তাই পাত্রের পর পাত্র মদ্য তারাও বেশ নির্ব্বিকারভাবে পান করে যাচ্ছে দেখে সে খুবই আশ্চর্য্য হয়েছিল। কিন্তু তারপর যখন সে দেখলে যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এরা একেবারে সম্পূর্ণ উদার— তখন বিস্ময়ের চেয়ে লজ্জাতেই সে অধিকতর অভিভূত হয়ে পড়ল!

কোরাস্ গানের গোল থামিয়ে আসরে তখন একলা কুমুদিনী গাইছিল—

"কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে,
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে!
কোয়েলা ডাকল 'আবার
যমুনায় লাগ্‌ল জোয়ার
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দু'নয়নে!"

কনক চাটুয্যে কুমুদের কটি বেষ্টন করে তার কণ্ঠের সঙ্গে নিজের সুরা জড়িত কণ্ঠ মিলিয়ে ধরলে—

"আজি মোর শূন্য ডালা
কেমনে গাঁথব মালা
কেমনে নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে!"

হেমদাস তখন একপাত্র সুরা নিয়ে কুসুমকে এক এক চুমুক খাওয়াচ্ছিল এবং নিজেও তাই থেকে এক এক চুমুক পান করতে করতে একটুখানি নাচবার জন্য কুসুমের পায়ে হাত দিয়ে তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছিল!

কুসুমের তখন বেশ একটু গোলাপী নেশা হয়েছে। স্ফূর্ত্তি করে সে হেমদাসের মুখে একটা চুমো খেয়ে

দুই মৃণাল বাহুর লীলায়িত ভঙ্গীর সঙ্গে গানের শেষ কলিটা গাইতে গাইতে উঠে পড়ল—

"—হয় তুমি থামাও বাঁশী
নয় আমারে লও হে আসি ;
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারি নে।"

সোমের মুখে সে যখন তাল-ফের্তা দিয়ে নাচের তেহাই মেরে ঘুরে দাঁড়াল, ঘরের ভিতর সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল,—"হায়! হায়! মরে যাই! কেয়াবাৎ! বাঃ বাঈজী! জিতা রহো! বহুৎ আচ্ছা!"

কুসুম বাঈজীদের ঢঙ্-এ ঈষৎ নত মস্তকে সকলকে অভিবাদন করে আবার নাচ শুরু করলো এবং হেমদাসকে তার সঙ্গে নাচবার জন্য টেনে তুলে নিলে।

হেমদাস উঠে পড়েই কনক চাটুয্যেকে বললে,—কঙ্কা, একখানা ইংরিজি গৎ বাজাতো ভাই, আমি মিস কুসুমিকার সঙ্গে খানিকটা ওরিয়েণ্ট্যাল ষ্টাইলে ওয়াল্টজ্ নেচে নিই!

কনক তখন নেশায় ভরপূর। সে অমনি টলিত চরণে উঠে পড়ে বললে,—খবরদার! এবার আমি আর মিস Lotus নাচবো!—পল্কা! পল্কা! ... ওরিয়েণ্ট্যাল ওয়াল্টজ্ কি? ধেৎ! ... এসো তো কুমুদ! সিধু, ধর তো ভাই হারমোনিয়মটা!—গোড়ায় একটু 'কেকওয়াক' দেখিয়ে দিই!

সিধু তখন সবে সোডাটি মিশিয়ে একটি গেলাস 'বিনির মুখের কাছে ধরে মৃদু কণ্ঠে বলছিল,—একটু প্রসাদ করে দাও না প্রাণ! এমন সময় কনক তাকে পিছু ডাকাতে সে চটে উঠে বললে,—নাচবি তো নাচ্ না বাবা! অতো চেঁচামেচি করছিস কেন! আমার এখন হাত জোড়া; বাজাতে পারবো না।

'বিনি' ওরফে বিনোদিনী বললে,—কুছ্ পরোয়া নেই কনকবাবু, আমি বাজাচ্ছি, আপনি নাচুন। কিন্তু কুমি কি —থুড়ি! আপনার মিস লোটাস্ কি পল্কা নাচ জানে? ওকে আর টানাটানি করছেন কেন?

'হাঃ হাঃ' হোঃ হোঃ' করে একগাল হেসে কনক বললে —আরে ছাই, আমিও কি জানি নাকি? তোমাদের সব তিনের পা—চারের পা সাধা আছে, বাঙ্লা নাচতে গেলেই বিছে ধরে ফেলবে। কিন্তু ইংরিজী নাচ বলে তালে তালে যদি হাত পা ছুঁড়ে যেতে পারি—ব্যাস্! আনাড়ী বলে ধরে আর কোন্ মিঞা?—কি বলিস্ হেমা? তুই বেটার ছেলে যেমন ওয়াণ্টজে ওস্তাদ—আমিও তেমনি পল্কায় কমতি যাবো না? কি বলিস্? এ্যাঁ?—

হেমদাস আপত্তি করে বললে,—আমি তা বলে তোর মতো একেবারে আনাড়ি নই! মাসখানেক ম্যানুয়েল বলে সেই ইটালীয়ান ছোঁড়াটার কাছে কিছু কিছু তবুও শিখে ছিলুম।

এবার জবাবে হেমদাস ইংরাজি নাচের যে কি শিখেছে সেইটে কনক একটা কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করে এমন অশ্লীল উত্তর দিল যে, সে ঘরে আর উপস্থিত থাকতে প্রকাশের ঘৃণা বোধ হতে লাগলো! সে নিঃশব্দে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে শুনতে পেলো ঘর শুদ্ধ লোক সেই কুপরিহাসটাকে খুব বেশী করেই উপভোগ করে তখনও পর্য্যন্ত হাসছে এবং কেউ কেউ সেই অশ্লীল কথাগুলো আবার পরস্পরের কাছে পুনরাবৃত্তি করছে। হেমদাস একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—কি বাবা, আমাকে বুঝি মাতাল মনে করে যা মুখে আসছে বলছো! কোন্ ব্যকুফ্ বলে মাতাল? আমি আলবৎ নাচতে পারি।

সিধু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, তোরা সব তর্ক করবি, না, আমোদ করবি? সব বেটা মাতাল হয়ে পড়েছে দেখছি! বোস্ বেটারা চুপ করে! আর নেচে ঢলাঢলি করতে হবে না! বিনি ডিয়ার, তোমার সেই প্রাণ-মাতানো গজলখানা ধরো তো ভাই, বেটারা সব 'মদনভস্ম' হ'য়ে যাক্!

বেশ বেশ! উত্তম প্রস্তাব!—

" পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়াছো তারে ছড়ায়ে!

পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণমন উল্লসি
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে!"

রাজি আছি বাবা ভস্ম হতে!

ব'লতে বলতে কনক চাটুয্যে কুমুদের গলা জড়িয়ে ধরে আসরে বসে পড়ল।

হেমদাস তখনও ওয়াণ্টাজ্ নাচটা নেচে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, হঠাৎ কনকের মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কবির উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার জানিয়ে বললে,—হ্যাঁ বাবা!—কবি বটে ... বিশ্বকবি-কবি, কবি-সম্রাট—এ সব শুনে মনে করতুম ভক্তরা যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে, কিন্তু বাবা যেদিন পড়লুম কবি লিখেছেন—

"অসীম ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান—"

ব্যাস্, ভক্তি হয়ে গেল! সেদিন থেকে আমিও একেবারে গোলাম! মহাকবির শ্রীচরণের পাদুকা হয়ে আছি!

বিনি ততক্ষণে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গজল সুরু করে দিয়েছে—

" বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্ নে আজিদোল্
আজো হায় ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল্!

—"হায়। হায়! হায়! হায়! কেয়া তোফা! ঘরশুদ্ধ লোকের প্রাণে যেন একটা নাচের ঢেউ এসে লাগল! কেউ বসে বসেই তালে তালে দুলতে লাগল! কেউ পা ঠুকতে লাগল! কেউ তালি দিতে লাগল, কেউ তুড়ি দিতে লাগল, কেউ বা শিস্!

হেমদাসের আর বসা হলো না। মদের গেলাস হাতে করেই গজলের তালে তালে কুসুমের হাত ধরে টেনে তুলে নৃত্য সুরু করে দিলে।

কুসুম ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল নাচিয়ে! কুসুমের সুঠাম নৃত্য ভঙ্গীতে উদ্বেজিত হয়ে খুশী ও নেশায় প্রমত্ত যুবকের দল তখন সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগল—

"আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশি দিন রে!
কবে সে ফুল-কুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে—

সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে গানের সেই গণ্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে কিন্নর কণ্ঠী কুমুদের মিহি গলা শোনা যেতে লাগ্ল—

"ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা আসবে ফুলেল্ বান্
কবি, তুই গন্ধে ভুলে ডুব্‌লি জলে কুল পেলি নি আর রে!"

গান যখন খুব জমে উঠেছে সেই সময় কার্ণিকখাওয়া বুকচেরা বাকা এসে বললে,—ডিনার রেডি! উঠে পড়ো সব, আর না! অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালে উঠে ছবি তুলতে যেতে হবে মনে থাকে যেন!

জনকতক লোক তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল, কারণ তাদের খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল, কিন্তু সিধু, কনক, হেম, প্রভৃতি উঠ্‌তে চাইলে না। মিনতি করে বললে,—আর একটু দেরী করো দাদা! এই যে বোতলটা খুলিছি এটা শেষ করেই উঠবো! মাল আর বেশী নেই, পাঁচ সাত গেলাস হবে!

বাঁকা বললে,—কাল সকালে উঠতে পারবি তো? যে রকম মাতাল হয়ে পড়িছিস সব, শেষটা ছবি তোলা না কাল বন্ধ হয়!

হেমদাস বল্লে—আরে কাল সকালের ভাবনা আজ রাত্রে কেন? সে কাল ভাবা যাবে।—তুই বেটা আমাদের চেয়েও মাতাল হয়ে পড়েছিস্ দেখ্‌ছি!

সিধু বললে,—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয় গে দাদা! কাল সকালে আমরা তোমার অনেক আগেই উঠ্‌বো, কিন্তু, দোহাই ব্রাদার, খোঁয়াড়ী ভাঙার ব্যবস্থাটা করে রেখো, নইলে কোনও কাজই করতে পারবো না। আর পান্সে তো

নীচে থেকে খানকতক গরম কাটলেট ভেজে পাঠিয়ে দাওগে।

বাঁকা বললে—আচ্ছা, এক ব্যাচ আমি ততক্ষণ খাইয়ে দিইগে, তারপর না হয় তোরা বসবি, কিন্তু একটু শীগ্‌গির শেষ করে নে! মাংসটা জুড়িয়ে যাবে!

বাঁকা চলে যেতে সিধু বললে,—ও না থাকলে যে আমাদের কি দুর্দ্দশা হতো সে আমিই জানি। বাজার করা, হিসেব রাখা, বামুন ঠিক করা, চাকর যোগাড় করা, জিনিষ পত্র সামলানো, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আবার ছবি তোলার হাঙ্গামা—সমস্তই ও একলা করছে! ছোঁড়াটা অসাধারণ খাট্‌তে পারে!

কনক চাটুয্যে এ কথা শুনে একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেললে!

সিধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি হ'ল দাদা? কান্না কেন?

কনক চাটুয্যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে,—আমার রেণুকে মনে পড়ছে! রেণুর মতো স্ত্রী আর হয় না! সেও আমার সংসারের সব কাজ করে! একলা, মাইরী বলছি! সেই রেণুকে আমি বাড়াতে ফেলে চলে এলুম! আসবার সময় সে কত বলেছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য! আমি পাষণ্ড! নিষ্ঠুরের মতো তাকে সেখানে রেখে চলে এলুম। ... ও হোঃ হোঃ হোঃ! রেণু আমার! ...

কনক ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল! সিধু বিরক্ত হয়ে বললে,—আঃ থামঃ,—কি মাতলামো করছো? স্ত্রীকে রেখে তুমিই কেবল একলা এসেছ বুঝি? আমরা স্ত্রীকে ফেলে আসি নি?

রোরুদ্যমান কনক বললে,—তোমরা আমার রেণুকে দেখনি, তাই অমন কথা বলছো! সে রকম মেয়ে পৃথিবীতে আর দুটি আমি দেখলুম না!—রং তো নয়, যেন ঈহার্ন কি লেড়কা! তার সেই টানা টানা ডাগর চোখ দুট মেলে যখন সে আমার মুখের দিকে চায়, মনে হয়—তখন কি মনে হয় জানস্? মনে হয়—যেন—নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—

বাধা দিয়ে হেমদাস একটি পরিপূর্ণ মদের গ্লাশ্‌ তার মুখের কাছে ধরে বললে—নে নে শালা, আর এক পাত্র টেনে নিয়ে তোর বক্তৃতা বন্ধ কর! তোর 'ওয়াইফো-ম্যানিয়া' হবার উপক্রম দেখছি!

সিধু বললে,—উপক্রম কি রকম? এ তো দেখছি রীতিমত set-in করেছে! চিকিৎসা করানো দরকার! ... কই, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল! বাঁ-পায়ের ক'ড়ে আঙুলে করে আমাকেও এক গ্লাশ্‌ হুকুম করো না হেম-দা।

—তা দিচ্ছি ভাই, কিন্তু এবার 'র' খেতে হবে। সোডা ফুরিয়ে গেছে!

—আরে রেখে দাও তোমার সোডা! সিদ্দেশ্বর ঘোষ এখনও এতটা invalid হয়ে পড়ে নি যে, without soda এক পাত্র মাল টানতে পারবে না, তুমি দাও বন্ধু, সোডা নেই ভালই হয়েছে! পান্‌সে লাগবে না! ও খাঁটি জিনিষ আবার ভেজাল কেন?

কনক তখন ঝিমুতে ঝিমুতে গান ধরেছে—

"শ্মশান ভাল বাসিস্‌ বলে
শ্মশান করেছি হৃদি,
ওমা, শ্মশান বাসিনী শ্যামা
তুই নাচ্‌বি বলে নিরবধি!"

সিধু তার গান শুনে বলে উঠলো,—বাহবা! বহুত আচ্ছা ভাই! বিরহ তাপে আর নিদান কালে এই সুরই ভাল। এই বার দাদা, একটু প্রাণ ভ'রে মায়ের নাম করো, শোনা যাক! ও ঘোম্‌টা-ওয়ালী বেটীদের গান আর বরদাস্ত করতে পারছি নে!

হেমদাস ঘুষা পাকিয়ে চীৎকার করে উঠল,—Shut up you fool! তারা এখানে নেই, খেতে গেছে বলে সেই advantage নিয়ে তাদের absence-এ তুমি যা তা বলবে মনে করেছো! সেটি হচ্ছে না সোনার চাঁদ! তারা অবলা সরলা গোপের বালা! তাদের defend করবার জন্য অন্তত একজন gallant knight এখানে উপস্থিত আছে স্মরণ থাকে যেন।

সিধুও আস্তিন গুটিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—What ? What do you think of me ? you silly drunken dog ! Come on—

সিধু versus হেম-এ একটা মুষ্টিযুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌ল, কনক টলতে টলতে তাদের মাঝখানে এসে পড়ে বললে—দাঁড়াও বাবা, আমি হচ্ছি তোমাদের umpire, যতক্ষণ না One-Two-Three বলবো কেউ এক-পা নড়তে পারবে না!—six yards off please !

যুদ্ধাভিলাষী দুই বন্ধু টলিত চরণে তৎক্ষণাৎ পায়ে পায়ে জমী মাপতে মাপতে পিছু হেঁটে যখন six yards সরে যাবার চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময় বাঁকা এসে বললে,—চল্‌রে, আর না, এই বেলা খেয়ে নিবি আয়, হোটেলের আলো নিবিয়ে দেবার সময় হয়েছে !—

সে একরকম প্রায় জোর করে তাদের হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল !

১৩

রামনিবাসবাগের যাদুঘরের পাশে পরের দিন সকাল থেকেই খুব ভিড় জমে গেছল !

বাঁকাদের যেখানে ছবি তোলা হচ্ছিল যাদুঘরের যাত্রীরা সবাই সেখানে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ক্যামেরার সামনে সেই "জন্মান্তরের" অভিনয় দেখছিল। সেদিন কি একটা ছুটির বার। ইস্কুল কাছারী সব বন্ধ ছিল বলে যাদুঘরে যাত্রীদের ভিড় একটু বেশী হয়েছিল।

বাঁকা বিরক্ত হয়ে বললে,—এ যে regular nuisance হয়ে উঠল! রোজ যদি এতগুলি করে দর্শক অনিমন্ত্রিত উপস্থিত থাকেন তাহলে কিন্তু ছবি তোলা এখানে impossible হয়ে উঠবে।

কনক চাটুয্যে বললে, site change করা ছাড়া আর উপায় নেই! এ একটা public place, ভিড় তো এখানে হবেই, তোমাদের যেমন বুদ্ধি!

হেমদাস বললে,—তোমরা এক কাজ করতে পারো, এই ভিড়টাকে utilise করে নিতে পারো! যদি তোমাদের ফিল্‌মে কোথাও crowd scene থাকে তাহ'লে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, shot করে নাও।

বাঁকা বললে,—Crowd scene আছে third part-এ, এখন কি !

হেমদাস বললে,—তা হলেই বা, তুই crowd scene-টা তুলে নিয়ে রাখ্, পরে ফিল্‌ম develop করবার সময় adjust করে নিলেই হবে। শুধু একটু joining-এর অপেক্ষা বই ত' নয় !

বাঁকা বললে,—সে situation-টাতে এ crowd খাপ খাবে না ! তোলা useless !

সিধু ফিল্‌মে বৃদ্ধ মহারাণার ভূমিকা নিয়েছিল। মাথায় বাবরীচুল এবং মুখে পাকা গালপাট্টা ও চাপ দাড়ি পরে সে অভিনয় করছিল। হঠাৎ ক্যামেরার সামনে থেকে সে ছুটে পালিয়ে এলো।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, ভিড়ের মধ্যে সে নাকি তার বাবার বিশেষ বন্ধু ভবনাথ বাবুকে স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

বাঁকা বললে,—তাঁরা এখানে এলেন কোত্থেকে ? দেখতে ভুল করিস্ নি তো ?

সিধু বললে,—না ঠিক তাঁরাই ? তাঁরা জয়পুরে বেড়াতে আসবেন শুনে এসেছিলুম।

বাঁকা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে জন্য কোনও ভয় নেই, ভবনাথ বাবুরা সিধুকে চিনতে পারবেন না ! সিধু যা make-up করেছে, তাতে দলের লোকেরাই তাকে চিনতে পারছে না।

সিধু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না, বললে,—না না, তোমরা বুঝছো না! যদি হঠাৎ চিনে ফেলেন তাহলেই সর্ব্বনাশ! অমনি বাবাকে গিয়ে বলে দেবেন ! আর বাবাকে জান তো ! তিনি এ সব মোটেই পছন্দ করেন না ! বায়স্কোপ তো দূরের কথা—জীবনে আজ পর্য্যন্ত কখনো তিনি থিয়েটার দেখতে যান নি !

কনক বললে,—সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

সিধু বললে,—দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য সেটা ঠিক বলতে পারিনি, কিন্তু তিনি শুনলে আর রক্ষে রাখবেন না। হয় ত আর আমার মুখদর্শনই করবেন না।

বাঁকা বললে,—ও মুখ তিনি যত না দেখেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল! ... নে, যা এইবার ক্যামেরার সামনে,—ঐ তাঁরা চলে যাচ্ছেন। আর ভয় নেই!

সিধু পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলো, ভবনাথ বাবু সত্যই স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন! তখন একটু সতর্ক হয়ে সে আবার অভিনয় করতে নামলো।

বাঁকা নিজে সেজেছিল একজন শালুম্ব্রা সর্দ্দার, আর কনক সেজেছিল একজন শক্তাবৎ যুবক।

এই দুঃসাহসী শক্তাবৎ যুবক মহারাণার মহল থেকে তাঁর একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা যোশীবাঈকে হরণ করে নিয়ে পালাচ্ছিল। গড় পার হয়ে দুর্গপ্রাকার প্রায় যখন অতিক্রম করেছে তখন বৃদ্ধ শালুম্ব্রা সর্দ্দার বীরসিংহ তাকে দেখতে পেয়ে বাধা দেন। দুজনে ভীম অসিযুদ্ধ হয়। বৃদ্ধের অমিতপরাক্রমের কাছে বীরত্বাভিমানী শক্তাবৎ যুবক ইন্দ্রসিংহ পরাস্ত ও বন্দী হয়ে মহারাণার কাছে তাঁর কন্যা সহ আনীত হয়।

আজ এই দৃশ্যই অভিনীত হচ্ছিল। রাজকুমারী যোশীবাঈ সেজেছিলেন শ্রীমতী কুসুমিকা। সবাই বলছিল কুসুমকে যা মানিয়েছে—চমৎকার! শুধু ওকে দেখবার জন্যই এ ফিলমে অন্তত তিরিশ week পিকচার প্যালেসে লোক ধরবে না।

ছবি তুলতে তুলতে বেলা প্রায় পড়ে এলো। প্রকাশকে এরা ছবি তুলতে আসবার সময় হোটেল থেকে ধরে এনেছিল বটে কিন্তু সে পালিয়ে গিয়ে যাদুঘরের ভিতর ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছবি তোলার ভিড়ের মধ্যে ছিল না।

পাখীর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রকাশ সাপের ঘরে ঢুকেই দেখলো, একটি যেন বাঙালী বাবু আর একটি বাঙালী মেয়ে সেদিন জয়পুরের যাদুঘর দেখতে এসেছেন। তাঁরা পিছন ফিরে নিবিষ্ট মনে কি একটা পাহাড়ী সাপ দেখছিলেন। পিছন থেকেই মেয়েটিকে দেখে প্রকাশের যেন বড্ড চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছিল। তাই সে একটু বিশেষ কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির মুখ দেখবার চেষ্টায় যেই ঘুরে দাঁড়াল, প্রকাশের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ... এ কি! এ যে অবিকল বিভার মতো? সে-ই কি?—বিভা!

বিভা কণ্ঠ-স্বরে চমকে মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলে সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রকাশ-দা!—

এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আনন্দের আতিশয্যে বিভা প্রথমটা এমনই অভিভূত হয়ে পড়'ল যে, তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না!

বিভার সঙ্গে ছিল নির্ম্মল। সে প্রকাশকে দেখেই চিনতে পারলে, এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিই বিবাহের রাত্রে তাকে খুব খাতির যত্ন করেছিল এবং পরের দিন তাদের ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিল। এই তো বিভার প্রকাশ-দা!

নির্ম্মল এগিয়ে এসে হৃদ্যতার সঙ্গে প্রকাশের করমর্দ্দন করে বললে,—এই যে প্রকাশবাবু! আপনিও জয়পুরে এসে-ছেন দেখছি! ভালই হয়েছে; আমার স্ত্রী ত আপনার জন্য একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে বসেছেন। দেশে থাকতেই কলকাতা থেকে চিঠি এসেছিল, তাতে উনি খবর পেয়েছিলেন যে, আপনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। ব্যস্, সেই দিন থেকে ওঁরও মনের আর আমি কোনও উদ্দেশ পাচ্ছিনি। আপনাকে খুঁজে বার করে দেবো এই লোভ দেখাতে তবে উনি আমার সঙ্গে জয়পুরে এসেছেন। কাল ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিলেন। আজ আমাদের কলেজ বন্ধ ছিল, তাই জোর করে ওঁকে এই যাদুঘরে টেনে এনেছি যদি মনটা একটু সুস্থ হয়। আপনি শোনেন নি বোধ হয় যে, বিয়ের পরই ওঁর প'য়েতে এখানকার কলেজে আমি একজন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছি।

নির্ম্মলের কথা শুনে বিভা একেবারে লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিল। সে মুখটি নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও কইলো না। তার সমস্ত রাগ-অভিমান গিয়ে পড়ল প্রকাশের উপর! কেন সে বিভার সন্ধানে জয়পুরে এসেছে? ছি ছি, এই বুঝি প্রকাশ-দা'র মনের জোর? এমন ক'রে দেশ-দেশান্তরে সে যদি আমার পিছনে ছুটে বেড়ায় তাহলে আমি কেমন ক'রে মন বাঁধতে পারবো!

নির্ম্মল প্রকাশের হাত ধরে বললে—আসুন—চলুন, আমাদের বাড়ীতে। আজ সেই খানেই আহারাদি করতে হবে। আমার নিমন্ত্রণ নিন্।

প্রকাশ কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল প্রায় এক রকম জোর করেই তাকে টেনে এনে গাড়ীতে তুললে।

বাড়ীতে পৌছে প্রকাশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে নির্ম্মল বিভাকে ডেকে বললে,—তোমার উপর অথিতির ভার রইল। আমি একবার ঝাঁ করে বাজারটা ঘুরে আসি। দেখি যদি এই বেলা গিয়ে অতিথি-সেবার যোগ্য কিছু সংগ্রহ করে আনতে পারি।

নির্ম্মল বাড়ীর বাইরে পা দিতে না দিতেই বিভা ব্যাকুল হয়ে প্রকাশকে বললে,—তোমাকে আমি হাত জোড় করে, মিনতি করে বলছি, তুমি দয়া করে এখনি এ বাড়ী ছেড়ে যেখানে হয় চলে যাও! এখানে আর এক দণ্ডও তোমার থাকা হবে না—প্রকাশ-দা, আমার অনুরোধ রাখ। পার তো আজই রাত্রে একেবারে জয়পুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেয়ো, লক্ষ্মীটি!

বিভার রকম দেখে প্রকাশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে সে শুধু ধীরে ধীরে বললে,—কিন্তু তোমার স্বামী—তিনি এমন আগ্রহের সঙ্গে আমাকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন, আর—

অধৈর্য্য হয়ে বিভা বললে,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি প্রকাশ-দা, তুমি এখানে আতিথ্য গ্রহণ করে তার চেয়েবেশী অপমান আমায় করো না। তুমি যাও—যাও, এখনি চলে যাও—

প্রকাশ থতমত খেয়ে উঠে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে বললে,—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমার স্বামীকে—

বাধা দিয়ে বিভা বললে,—সে তাঁকে যা বলবার আমি বলবো অখন; কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, আমি এখানে থাকতে তুমি আর কখনো জয়পুরে আসবে না—

বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো প্রকাশ বললে—না, আর আসবো না!

—আজই জয়পুর ছেড়ে চলে যাবে—যাবে বলো?

—যাবো।

প্রকাশ দরজায় পা বাড়াতেই বিভা ছুটে এসে প্রকাশের পায়ের উপর মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে উঠে বললে,—বাড়ী যাও, মা বড় কান্নাকাটি করছেন, তোমার বাবা খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন। উমারও দুশ্চিন্তার শেষ নেই! ও দিকে বিভা আর আমার বুড়ো বাপকে দেখবারও তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই। আমি যে তোমারই ভরসায় তাঁদের রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে এসেছি! আর তুমি কি না এই রকম ছেলেমানুষী করে বেড়াচ্ছো!

—আমাকে মাপ করো!

অপরাধীর মতো নত মুখে প্রকাশ চলে গেল। তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তপ্ত বায়ু বিভার বুকটা যেন দগ্ধ করে দিয়ে গেল! সে ঘরের মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল!

বিভার ব্যবহারে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রকাশ ধীরপদে হোটেলে ফিরে আসতেই দ্বারবানের কাছে শুনলে, একজন বুড়া বাবু অনেকক্ষণ থেকে তার জন্য উপরে অপেক্ষা করছেন!

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে,—কে তিনি? আমার সঙ্গে কি দরকার?

দ্বারবান বললে,—তা সে জানে না, বাবুটি কলকাত্তা সে আসছেন!

প্রকাশ চম্‌কে উঠল্! বাবা এসেছেন না কি? একছুটে সে উপরের ঘরে গিয়ে যা ভেবেছে ঠিক্ তাই! কর্ত্তা নিজে এসে হাজির!

প্রকাশ গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই কর্ত্তা উঠে তার দুই হাত ধরে মিনতি করে বললেন,—আমার অপরাধ হয়েছে খোকা! বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্! আর কখনো তোর প্রতি এমন অন্যায় আচরণ করবো না, চল্ বাবা বাড়ী চল্। লক্ষ্মী ধন আমার!

ইষ্টার্ণ সিনেমা সিণ্ডিকেটের দল তখনও রাম-নিবাসবাগ থেকে ফেরে নি। প্রকাশ চট্‌পট্ তার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে ষ্টেশনের দিকে রওনা হল।

ক্রমশ

আর কিছু নাহি সাধ

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আর কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তরে নহে জয়মাল্য, যশের মুকুট,
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হ'য়ে রজনীর শ্যামল অঞ্চলে—
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান জাগিবে না নীল নভস্তলে,
মোর কর-স্পর্শ কভু লভিবে না শ্রদ্ধা-সিক্ত অভিষেক-পল্লব-সম্পুট।
নর-চিত্ত-ভক্তি-তীর্থ নিত্যস্বর্গ নহে মোর; মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে
মনে জানি, পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত বাতায়ন-তলে,
সতীর্থের হৃদ্‌পদ্মে গন্ধরূপে ক্ষণিকের স্মৃতি-স্বপ্ন!—জানি তাও ঝুট্।

তবু যে জাগিছে আজি সঙ্গীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম-সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি। তোমারে যে পেয়েছিনু সর্ব্ব-অঙ্গে, মর্ম্মে মনে প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে মিলনের প্রফুল্ল বাসরে;—
সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে, তৃণ-পত্রে, সমুদ্রের কানে।
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ করে' যাই লক্ষ গানে-গানে।

মীনকেতন

ন্যুট হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একুশ

পা'র ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না, রাতে মাঝে মাঝে টন্‌টন্ করে,—জেগে থাকি। হঠাৎ চিড়িক দিয়ে ওঠে, বাদ্‌লা নাম্‌লেই বাতে ধরে। ঢের দিন হয়ে গেল। কিন্তু খোঁড়া হ'লাম না একেবারে।

দিন যায়!

ম্যাক্ ফিরেছে, খবর পেলাম। আমার নৌকো নিয়ে গেল; বেজায় অসুবিধায় পড়্‌তে হ'ল কিন্তু,—শিকার কিছুই জুটছে না। কিন্তু হঠাৎ নৌকোটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল কেন? ম্যাকের দু'জন লোক এক বিদেশী লোককে নিয়ে সকালবেলা নৌকো ক'রে হাওয়া খায়।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা!

"আমার নৌকোটা নিয়ে গেল।" বল্লাম।

"নতুন লোক এসেছে।" বল্লে ও—"সকালে বেড়াতে নিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। সমুদ্র দেখ্‌ছে।"

ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোক। ষ্টীমারে হঠাৎ ম্যাকের সঙ্গে দেখা হয়েছে,—ওকে সবাই ব্যারণ বলে' ডাকে। ম্যাকের বাড়ীতে ওকে দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। ও আসাতে বেশ একটা সোরগোল প'ড়ে গেছে যা হোক্।

মাংসের জন্য ভারি অসুবিধা হচ্ছে, বিকেলের জন্য এড্‌ভার্ডার কাছে কিছু চাইব ভাব্‌লাম। চল্‌লাম সিরিলাণ্ড্-এ। এড্‌ভার্ডার পরণে নতুন পোষাক, ও আরো একটু ডাগর হয়েছে,—ওর পোষাকের ঝুল্ আরো একটু লম্বা হয়েছে।

"উঠ্‌তে পাচ্ছি না, মাপ কর।' এইটুকু শুধু বল্লে, হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

"ওর শরীর ভাল না।" ম্যাক্ বল্লে—"ঠাণ্ডা লেগেছে। একটুও সাবধানতা নেয় না।... তোমার নৌকো চাইতে এসেছ বুঝি? ওটার বদলে তোমাকে আরেকটা দেব,—পুরোনো, তা হোক,—এখানে একজন নতুন লোক এসেছেন কি না—বৈজ্ঞানিক,—বুঝছই ত'।... তার একটুও সময় নেই, সারাদিন খাটে, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। এক্ষুণি যেয়ো না, আসুক সে, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুসি হবে। এই ওর কার্ড,—মুকুট ছাপ মারা—সে ব্যারন। ভারি চমৎকার লোক। হঠাৎ দেখা হ'ল।"

যাক্, খেতে বল্লে না। খালি যাচাই করতে এসেছি, বাড়ী ফিরে যাব এবার, ঘরে কিছু মাছ হয় ত এখনো আছে। খুব খাওয়া হ'ল, বেশ।

ব্যারন এল। বেঁটে, প্রায় চল্লিশ, চিম্‌সে মুখ, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, পাৎলা কালো-থুৎনি। চোখা চোখ্, জোরালো চশ্‌মা। শার্টের বোতামেও পাঁচ-মুখো মুকুটের ছবি। একটু নীচু হ'ল, পাৎলা হাতে নীল শিরা ফুলে উঠেছে, হাতের নোখগুলি হল্‌দে।

"খুব খুসি হলাম লেফ্‌টেনেণ্ট। আপনি কি এ জায়গায় বরাবর আছেন?"

"কয়েক মাস।"

বেশ ভদ্র। ম্যাক ওকে ওর সব মাপকাঠি তোলদাঁড়ি সমুদ্রের নানান্ খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বল্‌তে অনুরোধ করলে,—ওও খুসি হয়ে বলে' চল্‌ল,—কোথায় কি রকম কাদা, কোথায় কি ঘাস। বারে বারেই আঙুল দিয়ে

চশমাটা নাকের ওপর ঠিক মতো বসাচ্ছে। ম্যাক খুব উৎফুল্ল। একঘণ্টা কাট্‌ল।

ব্যারণ আমার সেই দুর্ঘটনার কথাও বল্লে।—সেই বন্দুক নিয়ে বিতকিচ্ছি কাণ্ডটা। ভাল হয়ে গেছি কি? শুনে খুসি হ'লাম।

কিন্তু কে ওকে বলেছে? বল্লাম, "কার কাছে শুন্‌লেন?"

"কে আবার? শ্রীমতী ম্যাক্। তুমিই নও?"

এড্‌ভার্ডা রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

বেচারা আমি,—এতদিন ধরে কি দারুণ বেদনা বুক চেপে ছিল, বিদেশীর শেষ কথা শুনে ভারি সুখ হ'ল। এড্‌ভার্ডার দিকে তাকাই নি, কিন্তু মনে মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। ধন্যবাদ, তুমি আমার কথা বলেছ, তোমার জিভ্ দিয়ে আমার নাম উচ্চারণ করেছ—নাই বা রইল তার কিছু দাম,—ধন্যবাদ!

বিদায় নিলাম। এড্‌ভার্ডা চুপ ক'রে বসেই রইল, ওর যে অসুখ। উদাসীনের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

ম্যাক উৎসুক হয়ে ব্যারনের সঙ্গে বকে' চলেছে। কন্‌সাল্ ম্যাকের গল্প করছে এখন—"সে কথা তোমাকে এখনো বলি নি হয় ত। এই হীরেটা রাজা কার্ল জোহান্ আমার ঠাকুরদার বুকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছি, কেউই দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল না। যেতে যেতে জান্‌লা দিয়ে একবার চাইলাম, এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে দুইহাতে পর্দ্দা সরিয়ে দেখ্‌ছে—দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী! নমস্কার করতে ভুলে গেলাম, চলে' গেলাম তাড়াতাড়ি।

বনে এসে পড়েছি। "দাঁড়াও।" নিজেকে বলি। বিধাতা এর শেষ কোথায়? মনে আর কোন অহঙ্কার নেই। এবার থেকে হৃদয় কেঁদে বেড়াবে,—ধূলো, হাওয়া মাটি,—হাঁ!

ঘরে গিয়ে মাছ পেলাম, খেলাম।

একটা পাঠশালার ক্ষুদে মেয়ের জন্য জীবন দগ্ধ করছ, দুর্ব্বহ তোমার রজনী। তপ্ত বাতাস হা হা করছে, গত বছরের দীর্ঘশ্বাস। অনির্ব্বচনীয় নীলে অপরূপ আকাশ, পাহাড় ডেকেছে আমাকে। আয় ঈশপ্...

এক সপ্তাহ কাটে। কামারের নৌকো ভাড়া করে' মাছ ধরে' চালাই। ব্যারনের সমুদ্র-ভ্রমণ বুঝি সাঙ্গ হয়েছে, বাড়ীতেই আছে আজকাল, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে থাকে। কারখানায় দেখেছিলাম একদিন। একদিন সন্ধ্যায় আমারই কুঁড়ের দিকে আস্‌ছিল ওরা, জান্‌লা থেকে সরে' গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলাম। ওদের একত্র দেখে কিছুই হয় না মনে, একটু কাঁধ দোলাই শুধু। একদিন রাস্তার ওপরেই দেখা।—অভিবাদনের বিনিময় হ'ল, ব্যারনই আমাকে আগে দেখ্‌ল, ইচ্ছে করে অভদ্র হবার জন্যে টুপিতে শুধু দুটো আঙুল ঠেকালাম। ওদের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চলে' গেলাম,—তাচ্ছিল্য করে' চেয়েও গেলাম একবার।

আরেক দিন কাট্‌ল।

অনেকগুলি দিন কাটে নি? মনমরা হয়ে গেছি,—সেই স্নেহার্দ্র ধূসর পাথরটিও পর্য্যন্ত বেদনা ও হতাশার চোখে আমার দিকে চাইছে। বৃষ্টি,—আবার বাতে ধরেছে, বাঁ পায়ে। এই বেরুবার সময়—

ঈশপকে বেঁধে রেখে ছিপ্ আর বন্দুক নিয়ে বেরুলাম। মন ভারি অস্থির।

"ডাকের জাহাজ কবে আস্‌বে রে।" একটা জেলেকে শুধোলাম।

"ডাকের জাহাজ? তিন হপ্তার মধ্যে —"

"ইউনিফর্ম্মটার জন্য অপেক্ষা করছি।" বল্লাম।

ম্যাকের সহকারীর সঙ্গে দেখা। অভিবাদন হ'ল। বল্লাম, "তোমরা আর তেম্‌নি হুইষ্ট খেল? সত্যি করে বল না।"

"হাঁ, প্রায়ই।"

চুপচাপ।

"অনেকদিন যাই নি।" বল্লাম।

মাছ ধরতে বেরুলাম। ভিজা দিন, মশারা ঝাঁক বেঁধেছে, ওদের তাড়াবার জন্য সমস্তক্ষণ তামাকের ধোঁয়া ছাড়্‌তে হয়। কয়েক ক্ষেপ বেশ হ'ল। দু'টো জলো পাখীও শিকার করলাম।

কামার সেখানে কি কাজ করছে। বল্লাম—"আমার ওদিকে যাচ্ছ ?"

"না।" ও বল্লে,—"ম্যাক আমাকে একটা কাজ দিয়েছে, অনেকক্ষণ রাত জাগ্‌তে হবে।"

কামারের বাড়ীর কাছ দিয়ে ঘুরে গেলাম। একা এভা দাঁড়িয়ে।

"সমস্ত মন দিয়ে তোমাকে চাইছিলাম,"—ওকে দেখে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছি, ও কিন্তু বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাতে পর্য্যন্ত পারছে না,—"তোমার ঐ দুটি চোখ ও এই যৌবন খুব ভালবাসি। আজ সমস্ত দিন তোমাকে না ভেবে আরেক জনের কথা ভেবেছি বলে' শাস্তি দাও আমাকে। তোমাকে দেখ্‌তেই এলাম, তোমাকে দেখ্‌লে ভারি সুখ হয়। কাল রাতে তোমাকে ডাক্‌ছিলাম, টের পেয়েছিলে ?"

"না।" ও যেন ভয় পেয়ে গেছে।

"ডাক্‌ছিলাম,—এড্‌ভার্ডা,—জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডা—কিন্তু সেই ডাক তোমাকেই। জেগে উঠ্‌লাম, শুন্‌লাম। সত্যি সত্যিই, তোমাকেই ডাক্‌ছিলাম। ভুলে এড্‌ভার্ডা নামটা মুখে এসেছে। তুমিই আমার প্রিয়া, এভা। কি সুন্দর লাল তোমার ঠোঁট! এড্‌ভার্ডার চেয়ে কত সুন্দর তোমার দুটি পা,—দেখ, চেয়ে দেখ।" ওর পোষাকটা একটু তুলে ওর পা দু'টি ওকে দেখালাম।

ওর সমস্ত মুখ খুসিতে ভরে' উঠেছে, চলে যেতে চাইল, কি ভেবে ওর বাহুটি আমার কাঁধের ওপর রাখ্‌ল।

একটু সময় কাটে। একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে' দুজনে খানিক কথা কই, কত কথা। বল্লাম,—"তুমি শুন্‌লে বিশ্বাস করবে না যে, জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডা ভাল করে' কথা বল্‌তে পর্য্যন্ত শেখে নি ?—ও বলে, 'অধিকতর বেশি সুখী।' নিজের কানে শুনেছি। ওর কপাল খুব সুন্দর, সেই কথা বল্‌ছ ? আমার মোটেই তা মনে হয় না। বিচ্ছিরি কপাল। হাত পর্য্যন্ত ধোয় না।"

"খালি ওরই কথা কইবে ?"

"না না। ভুল হয়ে গেছ্‌ল।"

আরো একটু সময়। কি যেন ভাবি, চুপ করে' থাকি।

"তোমার চোখ ভিজা কেন ?" এভা শুধোয়।

বলি,—"সুন্দর ওর কপাল, মিষ্টি দুখানি হাত; একবার শুধু কি কারণে জানি ময়লা ছিল। সবই ভুল বলেছি।" হঠাৎ রাগ করে' ঘুষি বাগিয়ে বলি,—"সমস্তক্ষণ তোমারই কথা ভাবছিলাম এভা। তুমি শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবে ঈশপকে প্রথম দেখে ও বল্লে—'ঈশপ? সে ত' প্রকাণ্ড পণ্ডিত,—ফ্রিজিয়ান।' শুন্‌লে,—কি বোকা! সেই দিন ঐ কথাটা ও নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে' এসেছিল।"

"হাঁ,"—এভা বলে,—"তাতে কি ?"

"মনে হচ্ছে, আরো বলেছিল ঈশপের মাষ্টারের নাম জ্যান্‌থাস্‌। হা হা হা।"

"বটে ?"

"কি বোকা, এতগুলি লোকের সাম্‌নে বল্লে জ্যান্‌থাস্‌ ঈশপের মাষ্টার! তোমার মন নিশ্চয়ই আজ ভাল নেই এভা, নইলে এই কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার নাড়ী ছিঁড়্‌ত।"

"হাঁ এটা মজার বটে।" এভা বলে; জোর করে' হাস্‌তে যায়। পরে বলে—"আমি তোমার মতো ভালো বুঝি না।"

চুপ করে' বসে থাকি, ভাবি চুপ করে'।

"তুমি কি এম্‌নি চুপ করে' বসে থাক্‌বে নাকি? কথা কইবে না?" ওর চোখে কি অপার সারল্য!—আমার চুলের মধ্যে ওর হাতখানি গুঁজে দিলে।

"চমৎকার তুমি।" ওকে বুকের ওপর টেনে আন্‌লাম। "তোমার ভালবাসার ক্ষুধায় আমি জর্জ্জরিত হচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

"হাঁ।" বলে।

ওর সম্মতি আর শুন্‌তে পাই না, ওর নিঃশ্বাসে অনুভব করি। আমার আলিঙ্গনে ও আত্মদান করে।

একঘণ্টা বাদে ওকে বিদায়চুম্বন জানাই,—চলি। দরজার সাম্‌নে ম্যাক।

ম্যাক নিজে।

চম্‌কে ওঠে, চারদিকে তাকায়, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই থাকে,—কিছু বল্‌তে পারে না।

"আমাকে দেখ্‌বেন বলে' আশা করেন নি নিশ্চয়।" টুপি তুলে বলি।

এভা নড়ে না।

ম্যাক নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে—"তোমার ভুল হয়েছে, তোমাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, পয়লা এপ্রিল থেকে এখানে আধ-মাইলের মধ্যে পাখী মারা বারণ হয়ে গেছে। তুমি আজ দুটো পাখী মেরেছ,—সবাই দেখেছে।"

"দুটো জলো পাখী শুধু।"

"যাই হোক্, তুমি আদেশ অমান্য করেছ।"

"করেছি। আইনের কথা মনে ছিল না।"

"কিন্তু মনে থাকা উচিত ছিল।"

"মে মাসে ঐ জায়গায়ই আমি আরো দুটো পাখী মেরেছিলাম, সে আপনার হুকুমে। সেই চড়ুইভাতির দিনে।"

"সে আলাদা কথা।" ম্যাক বলে।

"তা হলে আপনার কি করতে হয় জানেন?

"খুব।'

যাবার পথে এভা আমার পিছুপিছু একটু এল, মাথায় রুমাল বাঁধা,—ঐ দূর দিয়ে চলে গেল। ম্যাক বাড়ীর মুখে পা চালিয়েছে।

ভাব্‌লাম—নিজেকে বাঁচাবার জন্য হঠাৎ কি সব বাজে কথা পাড়া'। কি চোখা চোখ। দুটো গুলি, দুটো পাখী, জরিমানা,—কি ও সব? ওদিকে নিজের বাড়ী দিব্যি মেরামত হচ্ছে—

বৃষ্টি এসেছে, বড় বড় ফোঁটা,—ভারি সুকোমল। টুনটুনিরা উড়ে চলেছে। বাড়ী এসে ঈশপকে ছেড়ে দিলাম, ঘাস চিবোতে লাগ্‌ল।

বাইশ

সাম্‌নে সমুদ্র, বৃষ্টি হচ্ছে,—পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পাইপ্ টান্‌ছি অনেকক্ষণ,—ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠ্‌ছে,—তেম্‌নি আমার যত আজগুবি চিন্তা। মাটির ওপর কতগুলি শুকনো ডাল পড়ে আছে,—কোনো পাখীর ঝরা নীড়। তেম্‌নি আমার জীবন!

দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার মনে আছে।

সমুদ্র আর বাতাস কথা কয়ে' উঠেছে, ওদের আর্ত্তনাদ যেন আর শোনা যায় না। জেলে নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে,—কোথায় তাদের ঘর কে জানে। ফেনিল সমুদ্র মাথা কুটছে,—যেন কোটি দৈত্য পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেন বা কোন্ আনন্দ উৎসব! হয় ত বা মীনকুমার তার শাদা ডানা দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত করছে! সুদূর,—একাকী সমুদ্র!

একা আছি, এই আমার সুখ, আমার চোখে কারু চোখ পড়ে না। আর কেউ আমাকে দেখ্‌ছে না ভাবতে বেশ নিরাপদ লাগে, পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসি। ভাঙা চীৎকার করে পাখী উড়ে যায়, বাইরে বৃষ্টি পড়ে, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মধুর একটি উত্তাপ ও বিরাম লাভ করছি,—কত সুখ! আমার বোতামগুলি লাগাই, এই উত্তাপটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। খানিক বাদে ঘুমিয়েই পড়ি।

সন্ধ্যা। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ী ফিরি। আমার সাম্‌নে পথের ওপর এডভার্ডা দাঁড়িয়ে,—অদ্ভুত। একেবারে ভিজে গেছে, যেন বহুক্ষণ ধরে ভিজ্‌ছে,—অথচ মুখে হাসি। হঠাৎ রেগে উঠি মনে মনে, বন্দুকটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ওর দিকে এগোই। ও তেমনি হাসে!

"সুপ্রভাত।" ওই আগে বলে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে ঠাট্টার সুরে বলি—"প্রেয়সী, তোমাকে অভিবাদন।"

ঠাট্টার সুর শুনে ও একটু চম্‌কে ওঠে। ভীরু ওর হাসি, আমার দিকে তাকায়।

"পাহাড়ে গেছ্‌লে আজ?" শুধোয়। "তা হলে নিশ্চয়ই ভিজেছ। আমার সঙ্গে একটা রুমাল আছে, নিতে পার দরকার হ'লে,—দিয়ে দিতে পারি ... তুমি কি আমাকে চেন না!"

চোখ দুটি ধীরে নামায়, রুমাল নিই না বলে' যেন দুঃখিত হয়।

"রুমাল ?" রেগে বলি,—"আমার জামা আছে গায়ে, তুমি তা ধার নেবে ? দিয়ে দিতে পারি এটা। যে চায় তাকেই দি'ত পারি, একটা জেলে-মেয়ে চাইলেও।"

ও ওর সমস্ত মন ঢেলে শুনছে, তাই ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে ভারি,—ঠোঁট দুটো বুজে রাখতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। হাতে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শাদা রেশমী রুমাল,—এই মাত্র ঘাড়ের থেকে খুলে নিয়েছে। জামাটি গায়ের থেকে খুলে ফেলি।

ও বলে' ওঠে—"মাথা খাও, জামাটা খুলো না, পর ফের। এত রাগ করেছ কেন আমার ওপর ? সত্যি, পর জামাটি, একেবারে ভিজে যাবে যে।"

জামাটি গায়ে দিলাম।

"কোথাও যাচ্ছ ?" গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"কোথাও না।... কেন যে তুমি জামাটা তখন খুলে ফেল্‌লে ..."

"ব্যারনের সঙ্গে আজ কি হ'ল। এই বিশ্রী দিনে নিশ্চয়ই বেরুবে না।"

"গ্লাহন, একটি কথা বল্‌তে এসেছিলাম ..."

বাধা দিয়ে বল্লাম,—"তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ো।"

দু'জনের দিকে দুজনে তাকাই। ও কথা বল্‌তে গেলেই ওকে বাধা দেব। হঠাৎ ওর মুখ যেন বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে, ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল,—"সত্যি কথা বলছি, তুমি এই মহাত্মাটিকে বিদায় দাও এড্‌ভার্ডা। ও তোমার উপযুক্ত নয়। এ কয়'দিন ধরে' ও তবু অনবরত ভাবছে তোমাকে ও বিয়ে করবে কি না,—এ কি তোমার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ?"

"না, ও সব কথা রাখ। গ্লাহন, তোমাকে খালি মনে পড়ে। তুমি আর এক জনের জন্য এমনি শুধু শুধু জামা খুলে ভিজে মরবে ? কেন ? তোমার কাছে আমি এসেছি ..."

নিষ্ঠুর হয়ে বলি, "তার চেয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। তার বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বল্‌বার নেই। টাট্‌কা যৌবন, বুদ্ধিমান,—তুমি একবার ভেবে দেখ্‌লে পার।"

"কিন্তু দাঁড়াও, এক মিনিট, একটা কথা শোন।"

ঈশপ আমার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। টুপিটা তুলি, একটু নুয়ে পড়ে ফের ওকে বলি,—"প্রেয়সী, তোমাকে অভিবাদন।"

চল্‌তে পা বাড়াই।

ও কেঁদে ওঠে—"তুমি আমার মন ছিঁড়ে ফেল্‌ছ টুক্‌রো টুক্‌রো করে'। তোমার কাছে এসেছিলাম আজ তোমার জন্য এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি আসতেই হাস্‌লাম। কাল সারাদিন ভারি বিমনা ছিলাম, সমস্তক্ষণ কি ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল,—তোমারই কথা ভাবছিলাম খালি। আজ ঘরে বসে' ছিলাম, কে এল। জানতাম কে, তবু চোখ তুল্‌লাম না। 'দেড় মাইল দাঁড় টেনেছি।' ও বল্লে। বল্লাম,—'শ্রান্ত হও নি ?' 'ভীষণ।' ও বল্লে,—'হাতে ফোস্কা পড়েছে।' একটুবাদে ও বল্লে,—'কাল রাতে আমার জানালার ও-পিঠে কে ফিস্‌ফিস্‌ করে' কথা কইছিল। নিশ্চয়ই তোমার ঝি, আর ঐ গুদাম-ঘরের কেউ,—বেশ ভাব দুজনের।' 'হাঁ, শিগ্‌গিরই ওদের বিয়ে হবে।' বল্লাম। 'কিন্তু তখন যে রাত দুটো।' 'তাতে কি ? সমস্ত রাত্রিই ত ওদের।' সোনার চশ্‌মাটা নাকের ওপর আর একটু তুলে ও বল্লে,—'কিন্তু রাত দুটোয়,—কি বল, এটা কি ভালো দেখায় ?' তবু চোখ তুল্‌লাম না, তেম্‌নি আরো দশ মিনিট কেটে গেল। 'একটা শাল এনে তোমার পায়ে জড়িয়ে দেব ?' ও শুধোল। 'না, ধন্যবাদ।' 'যদি তোমার একখানি হাত আমাকে ধরতে দাও।' ও বল্লে। কিছু বল্‌লাম না আমি, কি যেন ভাবছিলাম, কার কথা। আমার কোলের ওপর ছোট্ট একটা বাক্স রাখ্‌লে, বাক্সের মধ্যে একটা ব্রোচ্‌। তাতে মুকুটের ছাপ মারা, দশটা পাথর বসানো তাতে ... গ্লাহন, সেই ব্রোচ্‌টা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, দেখ্‌বে ?

পায়ের নীচে ফেলে ওটাকে টুকরো টুকরো করে গুঁড়ো করে দিয়েছি,—এই দেখ। 'এই ব্রোচ নিয়ে আমি কি করব?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'পর।' ও বল্লে। ব্রোচটা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম,—'আমাকে একা থাকতে দিন। আমি অন্য এক জনের কথা ভাবছি।' 'কে সে?' 'বনের শিকারী।' বল্লাম,—'আমাকে সে ছটি মরা পালক দিয়েছিল, স্মৃতিচিহ্ন; আপনার ব্রোচ ফিরিয়ে নিন্।' কিন্তু কিছুতেই নেবে না। এই প্রথম ওর দিকে তাকালাম, ওর চোখ জ্বলছে। আমি কক্ষণো ফিরিয়ে নেব না, তোমার যা ইচ্ছা কর, গুঁড়া ক'রে ফেল।' ও বল্লে। দাঁড়ালাম, জুতোর গোড়ালির তলায় ওটাকে রাখলাম, গুঁড়া করে' ফেললাম। ও হচ্ছে সকাল বেলা।... বহুক্ষণ বাদে রাস্তায় ওর সঙ্গে ফের দেখা হ'ল। জিগ্গেসকরলে,— 'কোথায় যাচ্ছ?' 'গ্লাহনের সঙ্গে দেখা করতে।' বল্লাম,—তাকে বল্তে সে যেন আমাকে না ভোলে।'... একটা থেকে এইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম, তুমি দেব্তার মত দেখ্তে। তোমার ঐ দেহ ভালবাসি, তোমার চিবুক, তোমার কাঁধ,— তোমার সমস্ত।... কেন এত অধীর হচ্ছ? তুমি খালি চলে' যেতে চাও, খালি; আমি যেন তোমার কেউ নই, আমার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না ... "

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর কথা ফুরোল, হাঁট্তে লাগলাম। নৈরাশ্যে একেবারে শ্রান্ত হয়ে গেছি, হাস্লাম,—আমি নিষ্ঠুর।

হুয়ে পড়ে' বল্লাম,—"তাই নাকি? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা?"

আমার এই ঘৃণায় ও বিমুখ হয়ে উঠ্ল। বল্লে,— "তোমার সঙ্গে কথা? কৈ না ত; কোন কথা নেই।"

ওর স্বর কাঁপে,—কাঁপুক, কিছুই এসে যায় না আমার।

পর দিন সকালে এড্ভার্ডা তেম্নি কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে বেরুতেই দেখা হ'ল।

সারা রাত ভেবে মন ঠিক করে' ফেলেছি। একটা খেয়ালি, বাজে জেলে-মেয়ের পেছনে কতদিন ঘুরব?— ও আমার সমস্ত হৃদয় শুষে' নিয়েছে। ঢের হয়েছে। তবু মনে হ'ল ওর প্রতি এই নির্মম আচরণের ফলেই ওর আরো কাছে এগিয়ে এসেছি,—ওর এতক্ষণ ধরে' বক্তৃতা দেওয়ার পর বল্লাম কি না,—"তাই নাকি? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা?"

বড় পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এখুনিই যেন আমার কাছে ছুটে আস্বে,—এত অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। ও ওর বাহু মেলে ধরেছে, নীচু হয়ে হাত কচ্লাতে লাগ্ল এবার। টুপি তুলে ওকে নিঃশব্দে নমস্কার করলাম!

"তোমাকে একটি কথা তবু বল্তে এসেছি গ্লাহন—" অনুনয় করে ও বলছিল,—"শুন্লাম তুমি কামারের বাড়ী যাও! এক দিন সন্ধ্যায় গেছ্লে,—এভা একা ছিল।"

চম্কে উঠ্লাম, বল্লাম,—"তোমাকে কে বল্লে?"

ও চেঁচিয়ে উঠ্ল,—"আমি গোয়েন্দা নই, বাবার মুখে কাল বিকেলে শুন্লাম। কাল রাত্তে ভিজে যখন বাড়ী ফিরলাম, বাবা বল্লেন,—'তুমি ব্যারনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আজ।' বল্লাম—'না।' তিনি জিগ্গেস করলেন,—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?', বল্লাম,—'গ্লাহনের কাছে। তখন বাবা বল্লেন—"

বলি,—"এখানেও ত' এভা আসে।"

"এখানে আসে? এই ঘরে?"

"হাঁ, কত দিন। বসে' বসে' দুজনে কত গল্প করেছি!"

"এখানেও?"

চুপচাপ।

কঠিন হয়ে বলি তারপর,—"আমার ওপর তোমার যখন এত দরদ, তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? কাল তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তারকে বিয়ে করতে,— সে কথা ভেবে দেখেছ? ঐ ব্যারন-রাজপুত্র একেবারে অসম্ভব—"

রাগে ওর চোখ জ্বলে' ওঠে, বলে,—"না, নয়,— তুমি কি জান তার? তোমার চেয়ে ঢের ভাল, তোমার মত সে গ্লাশ বাটি ভাঙে না, জুতোতে হাত দেয় না কারুর।

সমাজে কি করে' মিশ্‌তে হয় সে তা জানে,—তুমি একেবারে বাজে,—অসহ্য। বুঝ্‌লে?"

বুকে এসে ওর কথা বেঁধে। মাথা নত করে বলি,—"বুঝেছি। সমাজে মিশ্‌বার আমি উপযুক্ত নই। বনে থাকি, সে-ই আমার সুখ। এখানে আপনার মনে একা থাকি, মানুষের ভিড়ে গেলেই ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। দুই বছর ধরে'ই ত এই বন-নির্ব্বাসন—"

ও বল্লে,—"এর পর তুমি যে কি সর্ব্বনাশ করবে কে জানে! সব সময়েই তোমার ওপর চোখ রাখা অসম্ভব।"

কি নিষ্ঠুর ওর কথা,—এখনো ফুয়োয় নি, আরো আছে। ও বল্লে,—"এভাকে এনে রাখ্‌তে পার, তোমার ওপর চোখ রাখ্‌বে। কিন্তু বেচারা যে বিবাহিত—"

"এভা? এভার বিয়ে হয়ে গেছে? বল কি?"

"হাঁ, হয়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে?"

"তুমি তা জান নিশ্চয়ই। ও কামারেরই বৌ।"

"আমি ভাবতাম ও ওর মেয়ে।"

"না, ওর স্ত্রী। তুমি কি ভাবছ আমি মিথ্যা কথা কইছি?"

তা ভাবি নি; একেবারে অবাক হয়ে গেছি। এভার বিয়ে হয়ে গেছে!

"বেশ পছন্দ করেছ যা হোক্?" এড্‌ভার্ডা বল্লে।

এর শেষ নেই; রেগে বল্লাম,—"তুমিও পছন্দ করে' ডাক্তারকে নাওগে যাও। বন্ধুর পরামর্শ শোন, তোমার ঐ রাজপুত্তুর একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ।" রেগে তার বিষয় ঢের মিথ্যা কইলাম, ওর বয়েস বাড়িয়ে বল্লাম, বল্লাম,—ওর মাথায় লম্বা টাক, রাত-কানা, নিজের আভিজাত্য দেখাবার জন্য শার্টের বোতামে মুকুটের ছাপ নিয়ে বেড়ায়। "ওর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা যায় না।" বল্লাম—"কিছুই ওর নেই, ও একটা ভুঁয়ো, যা-তা।"

"ও অনেক, ও অনেক।" এড্‌ভার্ডা বল্লে,—"তুমি ত একটা বুনো জানোয়ার, তুমি ওর কি জান? দাঁড়াও—ও নিজে এসে তোমার সঙ্গে কথা কইবে, আমিই ওকে বল্‌ব এখানে আসতে। তুমি ভাব্‌ছ আমি ওকে ভাল বাসি না,—তোমার ভুল। আমি ওকেই বিয়ে করব, দিন রাত্রি ওর কথা ভাবব। শোন, কান পেতে শোন আমার কথা,—আমি ওকে ভালবাসি। এভা যদি চায় ও আসুক না এখানে,—হাঃ হাঃ,—আসুক ও,—আমার তাতে কিছুই এসে যাবে না, —আমি পালাই ..."

কয়েক পা খুব জোরে ফেলেই একবার পেছনে তাকাল, মড়ার মত ম্লান মুখ,—আর্ত্তনাদ করে উঠল,—"তোমার মুখ আর দেখব না।"

তেইশ

গাছের পাতা হলদে হচ্ছে,—আলুর চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ফুল ধরেছে। আবার শিকারে বেরিয়েছি,—খোলা আকাশ, নিস্তব্ধ; সুশীতল রাত্রি, স্বচ্ছ ভাষা, এবং বনে বনে সুমধুর মর্ম্মরধ্বনি। পৃথিবী বিশ্রাম নিচ্ছে,—বিশাল পৃথিবী, শান্তিময়ী পৃথিবী।

"সেই দুটো জলো পাখী মেরেছিলাম, তার কি হ'ল ম্যাকের কাছ থেকে কিছুই জান্‌তে পেলাম না।" ডাক্তারকে বল্লাম।

ও বল্লে,—"তার জন্যে তুমি এড্‌ভার্ডাকে ধন্যবাদ দাও! আমি জানি, ওই তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"সে জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারব না।" বল্লাম।

মধুর গ্রীষ্ম! পাণ্ডুর অরণ্যের শিয়রে তারার মালিকা দোলে,—রোজ রাতেই একটি করে' নতুন তারা চোখ চায়। ম্লান চাঁদ,—বিষণ্ণ একটি রজতলেখা!

"এভা, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?"

"তুমি কি তা জান্‌তে না?"

"না ত'।"

নীরবে ও আমার হাত স্পর্শ করলে।

"কি করব তা হ'লে এখন?"

"তুমিই জান। এখুনি যাচ্ছ না ত'। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক, ততক্ষণই খুব ভাল লাগে।"

"না এভা।"

"হাঁ, যতক্ষণ তুমি কাছে থাক।"

ওকে ভারি নিঃসঙ্গ লাগে,—আমার হাত তেমনি নিবিড় স্নেহে ধরে' থাকে।

"না, তুমি যাও,—আর না।"

রাত যায়, দিন আসে। তারপর তিনদিন চলে' গেল। এভা মোট্ নিয়ে আসে। ও কতদিন একা একা এত ভার মাথায় নিয়ে বন পেরিয়ে বাড়ী গেছে,—তাই ভাবি।

"তোমার মোট নামিয়ে রাখ, এভা। দেখি, তোমার চোখ তেম্‌নি নীল আছে কি না।"

ওর চোখ নীল।

"না, মুখ ভার করো না এভা, হাস'। আমি নিজেকে আর ধরে' রাখ্‌তে পারি না, আমি তোমার,—তোমার।"

সন্ধ্যা। এভা গান গায়, তাই শুনি,—সমস্ত দেহপ্রাণ তপ্ত হয়ে ওঠে।

"তুমি আজকে সন্ধ্যায় গান গাইছ।"

"খুব ভালো লাগ্‌ছে।"

ও আমার থেকে একটু বেঁটে, তাই একটু লাফিয়ে ও আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে' ধরে।

"এ কি, এভা, তোমার হাত ছ'ড়ে গেছে।"

"ও কিছু না।"

ওর মুখ আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"এভা, তোমার সঙ্গে ম্যাক্-এর কথা হয়েছে?"

"হঁ্যা, একবার।"

"কি বল্লে ও? তুমিই বা কি বল্লে?"

"আমাদের সম্বন্ধে এখন সব কড়াকড়ি করছেন আজকাল,—আমার স্বামীকে দিনরাত্রি খাটাচ্ছেন,—আমাকেও। আমাকে এখন মুটেমজুরের কাজে লাগিয়েছেন।"

"কেন এ সব করছে?"

এভা চোখ নামায়।

"কেন এ সব ও করছে, এভা?"

"কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু কি করে' ও জান্‌লে?"

"আমি ওঁকে বলেছিলাম।"

চুপচাপ।

"ও যেন তোমার প্রতি আর নিষ্ঠুর না হয়, ভগবা তাই করুন।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। কিছু না।"

ওর কণ্ঠস্বর যেন বনের মধুর মর্ম্মরসঙ্গীত।

অরণ্য আরো পাণ্ডুর,— শরৎ কাছে এসেছে; আকাশে আরো কয়েকটি তারা চোখ মেলেছে,—চাঁদ এখন যেন স্বর্ণলেখা! শীত নেই,—একটি শীতল নিস্তব্ধতা, বনের অন্তরে যেন দুর্নিবার প্রাণ-চাঞ্চল্য। সমস্তগুলি গাছ যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছে।

তারপরে এল একুশে আগষ্ট,—তিনটি কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নিঃসাড় রাত্রি।

—ক্রমশ

ঝরাফসলের গান

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

আঁধারে শিশির ঝরে,
ঘুমোনো মাঠের পানে চেয়ে' চেয়ে' চোখ ছুটো ঘুমে ভরে !
আজিকে বাতাসে ভাসিয়া আসিছে হলুদপাতার ঘ্রাণ,
কাশের গুচ্ছ ঝ'রে পড়ে হায়,—খ'সে প'ড়ে যায় ধান,
বিদায় জানাই,—গেয়ে যাই আমি ঝরাফসলের গান,—
নিভায়ে ফেলিও দেয়ালি আমার খেয়ালের খেলাঘরে !

ওগো পাখী, ওগো নদী,
এতকাল ধ'রে দেখেছ আমারে,—মোরে চিনে' থাক যদি,
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,—
জেনো আমি এক ছুখ-জাগানিয়া,—বেদনা জাগাতে চাই !
পাই নাই কিছু, ঝরাফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি,—মরণেরে ঘিরে এ মোর সপ্তপদী !

ঝরাফসলের ভাষা
কে শুনিবে হায় !—হিমের হাওয়ায় বিজন গাঁয়ের চাষা
হয় তো তাহার সুরটুকু বুকে গেঁথে, ফিরে' যায় ঘরে,
হয় তো সাঁঝের সোনার বরণ গোপন মেঘের তরে
সুরটুকু তার রেখে' যায় সব,—বুকখানা তবু ভরে
ঘুমের নেশায়,— চোখে চুমো খায় স্বপনের ভালোবাসা !

ওগো নদী,—ওগো পাখী,—
আমি চ'লে গেলে আমারে আবার ফিরিয়া ডাকিবে নাকি !
আমারে হারায়ে তোমাদের বুকে ব্যথা জাগে যদি ভাই,—
জেনো আমি এক ছুখ-জাগানিয়া,—বেদনা জাগাতে চাই !
পাই নাই কিছু, ঝরাফসলের বিদায়ের গান তাই
গেয়ে যাই আমি,—গাহিতে গাহিতে ঘুমে বুজে' আসে আঁখি !

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১৩

নয়নতারার মৃত্যুর পর পরিবারে একটা শোকের ঘনছায়া নামিয়া আসিলেও দুর্য্যোগের রাত্রিও যেমন করিয়া কাটিয়া যায়, কিছুকালের মধ্যেই ইহাও কাটিয়া গেল।

চাকরী, স্ত্রী ও সংসার লইয়া অজয় ব্যস্ত। সুষমা যখন প্রথম এই পরিবারে আসিয়াছিল, তখন সকলেই তাহার স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। নূতন বউ ঘরে আসিয়াই শাশুড়ীর এমন সেবা করিল ইহা দেখিয়া কাহার না ভাল লাগে।

কিন্তু সুষমা যে দিন হইতে বুঝিতে পারিল বাড়ীর কর্ত্তা কেবল অজয় নয়; এই সংসারটির উপর শোভনা, বিমলা এবং দীপকেরও যথেষ্ট কর্ত্তৃত্বের অধিকার রহিয়াছে, তখন হইতেই সুষমার চালচলন ও কথাবার্ত্তা যেন ক্রমেই বদলাইতে লাগিল।

সুষমার ব্যবহারে এখন আর সে সহৃদয়তা নাই, সংসার বা পরিজনের জন্য যেন কোনও মায়া নাই।

নয়নতারার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে টাকাপয়সা খরচের ভার ও সংসার দেখার ভার সকলেই আগ্রহ ভরে সুষমার হাতেই সঁপিয়া দিয়াছিল।

মাসের পর মাস যেমন যাইতে লাগিল সকলেই লক্ষ্য করিল, সুষমা অমিতব্যয়ী ও অবুঝ। অনেক জিনিষ চোখে পড়িলেও কেহ বড় একটা তাহাকে কিছু বলিত না কিন্তু তবুও সুষমার দিক হইতে অভিযোগের সংখ্যা যেন বাড়িয়াই চলিল।

বিমলা ও শোভনা তাহাকে যথাসাধ্য মিষ্টি কথাতেই যাহা কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু সুষমার পাকা স্বভাবের উপর আর কোনও রং ধরিল না। বরং যতটুকু মাধুর্য্য যে কোনো গৃহস্থ-স্ত্রীলোকের ব্যবহারে ও কথায় আশা করা যায়, সুষমার প্রকৃতি হইতে যেন সেটুকুও কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর বউ যদি অবুঝ হয়, অন্য সকলকে একটু বেশী করিয়াই সহিষ্ণু হইতে হয়। এ পরিবারেও তাহাই হইল কিন্তু তাহাই সুষমার কাল হইল।

সকলে মনে করিত অজয় যাহা হয় বুঝাইয়া পড়াইয়া বলিবে, কিন্তু অজয় প্রথম কিছুদিন যতটুকুও বলিত কহিত, পরে আর তাহাও করিত না। কারণ একই। একটা ভাল কথা বলিলে দশটা কড়া কথা শুনিতে হয় এমনই অবস্থা। কাজেই অজয়ও বোধ হয় মনে করিল এ ক্ষেত্রে চুপচাপ করিয়া থাকাই ভাল। কে আর ডাকিয়া সাধিয়া সংসারে অশান্তি আনিতে চায়।

কিন্তু সুষমা আরও পাইয়া বসিল। সে যখন বুঝিল সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলে তখন তাহার মুখে আর কোনও কথাই বলিতে বাধিত না।

দীপক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল, এ রকম প্রকৃতি যাহাদের তাহাদের স্নেহের জোরে, মিষ্ট ব্যবহারে শুধরাইয়া লওয়াই একমাত্র পথ। মনের সংকল্প সে কাজে খাটাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইতে লাগিল বিপরীত।

কিছু বলিতে গেলে সুষমা স্পষ্টই বলিতে আরম্ভ করিল, আমার স্বভাবই বাপু এ রকম। তোমরা ভাল আছ, ভাল থাক।—তারপরেই চোখ ফুলাইয়া কান্না।

বৎসরাধিক নানাবিধ চেষ্টার ফলেও যখন দেখা গেল প্রতিমাসেই সংসার খরচে দেনা হয়, অসাবধানে ও অযত্নে জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া অনর্থক নষ্ট হয় তখন অজয় নিজের হাতেই সংসার চালাইবার ভার লইল।

তাহাতেও বিপদ, সুষমা এ ব্যবস্থায় মুখে কিছু বলিল না বটে কিন্তু ছোটখাট খুঁটিনাটি ব্যাপারে এমনই সব কাণ্ড ঘটাইতে লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব আসিলেও তাঁহার পিত্ত চটিয়া যাইত।

কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর এই পৃথিবীটা। সুষমা অন্তঃস্বত্তা হইল। শোভনা বিমলা মনে করিল বুঝিবা ছেলে-পুলে হইলে সুষমার মেজাজটা বদ্‌লাইয়া যাইবে। সেই আশায় দিন গণিতে গণিতে নবশিশু জন্মগ্রহণ করিল।

দীপক ত অধীর আনন্দে সেই দিনই শিশুর নামকরণ করিল কল্যাণী। কিন্তু নাম দিয়া অকল্যাণ চাপা দেওয়া গেল না।

সুষমা আগে পরে তেমনি থাকিয়া গেল। বরং নিজের সন্তানকে মানুষ করিতে যাইয়া সুষমা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। অজয় নীরবেই সব সহ্য করে। বাড়ীর অন্যলোকদের ত কথাই নাই।

শোভনা রাঁধিলে সুষমা খায় না। সে নাকি কাহার কাছে কি শুনিয়াছে, শোভনার হাতে সে খাইবে না। বউয়ের শরীর ভাল না। বিমলা সাধ করিয়া নানা ব্যঞ্জন রাঁধে, সুষমার তাহা মুখে রোচে না।

সুষমা নিজেই রান্না করে। অজয়ের আপিসের বেলা হইয়া যায়, তাহার জন্য তাহার কোনও ভাবনা নাই। বিমলা হয় ত ভয়ে ভয়ে বলে, সুষমা, দুখানা কিছু ভেজে দাও। ঠাকুর-পো এখনি খেতে আস্‌বে, শুধু ডাল দিয়ে খেয়ে যাবে!

একেবারে কুরুক্ষেত্র। খাইতে বসিয়াও অজয়ের শান্তি নাই। মুখের গ্রাস ফেলিয়া অজয় আপিসে চলিয়া যায়। তাহাতে কাহার কি। সুষমার তাহাতে কোনও দুঃখ নাই। বিমলা শোভনা কোনও মতে ভাত গেলে। দীপক রাগ করিয়া খায় না।

সারাদিন উপবাসী থাকিয়া অজয় ঘরে ফেরে। সুষমা গজ্‌ গজ্‌ করিয়া নিজের মনে বলিয়া যায়—না খেয়ে বাহাদুরী করা সে অনেকেই পারে। কি সংসার বাবা! সব ক'টিই এক রকম!

ঘর দুয়ার থম্‌ থম্‌ করিতেছে। দীপক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া দেখে বাড়ীটার যেন কে কণ্ঠরোধ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অশান্তি ও বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। ক্ষুধা চলিয়া যায়। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুইয়া পড়ে। কে বোঝে সে ব্যথা। রান্না-ঘরের বাসনপত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ ও তাহার সঙ্গে নিষ্ঠুর কথাগুলি যেন দীপকের সমস্ত সত্তাকে নিজেরই কাছে অসহনীয় করিয়া তোলে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সে শুনিতে পায়,—সব নবাব, নবাব! এ খাবে না, ও খাবে না—রোজ রোজ ভাত ফেলাই বা কেন আর আমার এত কষ্ট করে রান্নাই বা করা কেন। এবার থেকে যে খাবে না, তাকে ঐ বাসি ভাতই খেতে হবে।

অজয় মাথা নীচু করিয়া ভাতগুলি গিলিয়া যায়। শোভনা মুখে কাপড় ঢাকিয়া এক কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। দীপক অনিচ্ছায় আসিয়া খাইতে বসে। দিন এমনি করিয়াই চলে।

দীপকের মন ক্রমেই ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবে, মা গিয়াছেন ভালই হইয়াছে। তিনি ত মনে আনন্দ লইয়াই গিয়াছেন।

এ রকম অশান্তির মধ্যে তাহার থাকা মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক হইয়া উঠিল। সে ইচ্ছা করিলে অন্য কোথাও গিয়া একলা থাকিতে পারে। কিন্তু অজয়কে এ অবস্থায় একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে তাহার মনে বাধে। অজয় দেবতার মত মানুষ—তাহার অদৃষ্টে কেন এ দুর্ভোগ তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন চায় না। মনে হয় বুঝি অজয় তাহা হইলে একদিন মরিয়া যাইবে, কল্যাণীটার অবস্থা না জানি কি হইবে, বড়দার ছেলে-পুলে, বিমলা, শোভনা এদেরই বা কি হইবে? তবু মনে হয়, থাক্‌ এ সব একদিকে পড়িয়া। এত ছোট জিনিষ লইয়া জড়াইয়া থাকিলে তাহার যে আরও কত বড় কাজ পড়িয়া আছে তাহা কেমন করিয়া হইবে?

ভাবে, ভাবে—আর শুষ্ক বিশীর্ণ দিনগুলি যেন তাহার মাথা পর্য্যন্ত গুঁড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

নয়নতারার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কল্যাণ বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। অনেকদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পর কথায় কথায় দীপক তাহাকে প্রায় সব কথাই বলিল। মনের দুঃখে বলিল, তোমার কি সুন্দর জীবন। আপন ইচ্ছামত কত বড় বড় কাজ করছ, কত আনন্দ তোমার!

কল্যাণ শুধু বলিল, মনে কর, এই সংসারটার জন্য যা কিছু করা তাই সব চাইতে বড় কাজ। এর চাইতে বড় কাজ আর নেই। এ সংসারকেই নিজের সব কিছু দিয়ে সেবা করে যাব এইটেই আমার পক্ষে বড় কাজ, মহৎ কাজ;—এই কথাটা মনে সংকল্প কর দেখি। আমি তোমাকে উপদেশ দিতে পারি না। তুমি আমার মামা, কিন্তু আমি তোমার বন্ধুও। মানুষকে সাপে কামড়ায়, অন্য মানুষই সে বিষ নিজে মুখে করে চুষে নেয়। পরের দুঃখ এমনি করেই বইতে হয়। আমার গৃহ নেই, পরিবার নেই, তাই আমার জীবনের এই গতি।

দীপক এক দিন অজয়কে বলিল, কি করবে ভেবেছ?

অজয় বলিল, কি আবার করব? মানুষ হোলে তাকে বোঝান যায়। আমি ভার নিয়েছি, সে ভার আমি বইব। এতে দুঃখও আছে, আবার বয়ে যেতে পারলে একটা তৃপ্তিও আছে। জানি তাঁকে সকলে ঘৃণা করে, কিন্তু তাঁকে সইতে পা'রে এমনও ত কেউ থাকা দরকার।

দীপকের মনে হইল কথাটা সত্যই ত। বলিল, কিন্তু তবুও ও'র এ অন্যায়।

অজয় দৈনিক হিসাবের খাতা লিখিতেছিল। মাথা না তুলিয়াই বলিল, জানি অন্যায় করছেন কিন্তু তোমরা সবাই তাঁকে ছেড়ে দিলেও অমি ত ছাড়তে পারি না। একটা কথা বলি দীপক, কিছু মনে করো না। শোভনা দিদির স্বামী, দিদি এর চাইতে গুরুতর একটা অপরাধ করেছেন মনে করেই না দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি আমি বা শোভনা তবু কি তাঁকে তার জন্য ক্ষমা করতে পেরেছি। সে কথা কি আজ মনে নেই!

দীপক বলিল, আমার অভিপ্রায় তা নয়। আমি বলি না তাঁকে ছেড়ে দাও। কিন্তু শাসন করাও কি তোমার দরকার নয়?

অজয় মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার স্ত্রীকে যে আমার শাসন করা দরকার এ কথাটা ভেবেই কি আমি যথেষ্ট ব্যথা পাই না? কিন্তু কি করব, শাসনকে যে সইতে চায় না তাকে শাসন করার চাইতে তার আর কি বেশী অপকার করা যায়?

দীপক একটু কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, তোমার জন্য যে ভয় হয়।

অজয় হাসিয়া তেমনি স্থির ভাবে উত্তর করিল, ভয় আমার জন্যও আছে, কিন্তু তার চাইতে তাঁর জন্য বেশি। ভেবে দেখ দেখি, আজ আমিও যদি তাঁরই মত অবুঝ হোতাম তাহলে তাঁর কি অবস্থা হোত। তাই আমার জন্য আমার ভয়, পাছে আমি কোনও দিন কোনও কারণে আমার জ্ঞান হারাই। এবং তাঁর জন্য ভয়, যদি সেই অবস্থায় তাঁর প্রতি আমি কোনও দিন কোন রূঢ় আচরণ করি।

দীপকের মন তবুও যেন সায় দিতে পারিল না। সে বলিল, তিনি যে তোমার স্ত্রী!

অজয় উত্তর করিল, ঠিক কথা! তিনি আমার স্ত্রী এবং আমি তাঁর স্বামী। পরস্পরের সুখদুঃখের ভার উভয়েরই বইবার কথা, তা' একজন যদি না পারে অন্যকে ত তা বইতে হবে। আমাকে লোকে কাপুরুষ বলতে পারে। কিন্তু আমি নিজে ভাবি আমি ততক্ষণই পুরুষ যতক্ষণ এই সংসার-যাত্রায় তিনি অক্ষম, তাঁর এবং আমার উভয়ের ভার বইতে পারব। দীপক, দুঃখ আমার আছে এবং দুঃখের পীড়নে এক এক সময় মনে হয় এ জীবন দুর্ব্বিসহ, এই

বিবাহিত জীবন বিষময়। কিন্তু দুঃখ আসে অপরিচিতের মত, পরে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে তার সঙ্গেই তখন আত্মীয়তা হয়ে যায়। দুঃখ আমাদের জীবনের অতিথি, তাকে সমাদরে স্থান দিতে হবে।

দীপক তবু বলিল, কল্যাণী এবং তারপর যারা আসবে তাদের অবস্থা ?

অজয় বলিল, আমি না বাঁচি তোমরা আছ। পৃথিবীতে একের দায় অন্যে ত বয়েই থাকে, তুমি ত তবু তাদের আত্মীয়। মনে কর, বাড়ীতে একজন পাগল আছে। সে যে কতবড় অসহায় তা সে নিজে জানে না। তাকে স্নেহে, ক্ষমায় পালন করা এ ত সকলেরই কর্ত্তব্য।

দীপক আর কিছু না বলিয়া বিদায় লইল। তবু মনে একটা অশান্তি থাকিয়াই গেল।

১৪

প্রায় প্রতিদিনই দীপক কাজ হইতে ফিরিবার সময় পুষ্পদের বাড়ী হইয়া আসিত। পুষ্পর মা বাবা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যে দিন আলাপ বেশ জমিয়া উঠিত সে দিন দীপকের বাড়ী ফিরিতে বেশ দেরী হইয়া যাইত। এ জন্যও সুষমা কম কথা বলে নাই। এমন কি এই কারণে এত দিনের বন্ধু পুষ্পকে সুষমা একটু ঘৃণার চক্ষেই দেখিত।

একদিন শনিবার। দীপক যাইয়া দেখে পুষ্প একা, বাড়ীতে অন্য কেহ বড় নাই। দুই একটা কথা বলিয়াই সে ফিরিয়া আসিতেছিল, পুষ্প তাহার এই সঙ্কোচ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, এত ছোট কথা যারা ভাবে তারা কি কোনও বড় কাজ করতে পারে ?

দীপক হঠাৎ কথাটা বুঝিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কার কথা বল্ছ ?

পুষ্প হাসিয়া বলিল, ঘরে এসে ভাল করে বসুন, কার কথা বল্ছি তা' বল্ব।

অগত্যা দীপক ঘরে গিয়াই বসিল। পুষ্প একখানি রেকাবীতে কিছু জল খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, আপনি খেতে থাকুন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি।

এটা দীপকের অভ্যাস ছিল। আসিলেই খাওয়া এ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

পুষ্প বলিল, আপনারই কথা বলছিলাম। মা বাবা বাড়ীতে নেই বলে' আপনি একটি ভদ্র-কন্যার কাছে একলা থাকিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। তাই ত ?

দীপক বলিল, সত্যিই তাই। আমার নিজের দিক দিয়ে কোনও সঙ্কোচ মনে না থাকলেও ভদ্র-সমাজের প্রচলিত রীতি ও বিধি অনুসারে এ রকম অবস্থায় আমার চলে যাওয়াই সঙ্গত হবে বলে মনে হয়েছিল।

পুষ্প বলিল, সেটা মনে হওয়া আপনার পক্ষে অন্যায় হয় নি। কিন্তু আপনি বলে বিশেষ করে বল্ছি, আপনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা কম দিনের নয়। আপনার সঙ্গে একলা কখনও বসে' কথা বলি নি এমনও নয় এবং আর বিশেষ আপনার যখন আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার মধ্যে বিশেষ কোনও অভিসন্ধি নেই—তখন আপনার পক্ষে এটুকু বাধা বাধাই হ'তে পারে না।

দীপক একটু চটিয়াই উঠিল। ইচ্ছা হইল পুষ্পকে দুইটা কথা কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু কি ভাবিয়া বেশ একটু শ্লেষের সহিত বলিল, তোমার কথায় আমার একটা উত্তর দিতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু তা দিলাম না। তোমরা এমন একরকম জীব যে, যাদের কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না।

পুষ্প বলিল; এটা কি আপনার কোনও বইয়ে-পড়া কথা ?

দীপক একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল সত্য। সামলাইয়া লইয়া বলিল, আমার কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও নি। আমি বল্তে চেয়েছিলাম, তুমি আজ আমাকে আদর করে একলা বাড়ীতে ঘরে এনে বসালে, আবার তুমিই হয় ত প্রয়োজন বোধে বলতে পার যে তবুও আমার থাকা উচিত হয় নি। কাজেই কোন্ অবস্থায় তোমাদের

সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় তা' আজও পর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে পারে নি।

পুষ্প বলিল, বলুন, কোনও পুরুষ বল্‌তে পারে নি।

দীপক জোর করিয়া বলিল, না, কোনও মেয়েও তা বল্‌তে পারেন নি।

পুষ্প বলিল, দেখুন, বিশ্বাস করতে পারা এক জিনিষ, আর বিশ্বাস করতে পারব কিনা তা ভাবা অন্য জিনিষ।

দীপক হাসিয়া বলিল, দুটো অবস্থা আলাদা হতে পারে। কিন্তু কিছু না ভেবে ত কেউ কারুকে বিশ্বাস করে না।

পুষ্প মশলার ডিবেটা আগাইয়া দিয়া বলিল, মানুষ বিশ্বাস করতে পারে তখনই যখন সে নিজের হানিটা কত খানি হতে পারে তা' না ভাবে। তাই সকলকে বিশ্বাস করার সৌভাগ্যও সকলের হয় না।

দীপক কিছু মশলা হাতের তেলোয় রাখিয়া বাছিতে বাছিতে বলিল, কিন্তু বিশ্বাস করে' মানুষ যে শেষে পরের হাতে দুর্ভোগ ভোগ করে তাও কি কম দুর্ভাগ্য?

পুষ্প উত্তর করিল, হাঁ, তা দুর্ভাগ্য বটে আর তার ব্যথাও কম না। কিন্তু আমি মনে করি, বিশ্বাস করে বড় হয়ে থাকার মত সৌভাগ্যও কম নয়। যে বিশ্বাসের অপমান করল, সে ত ছোট হয়ে গেল!

দীপক কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, এমনও ত হতে পারে, একজন মানুষ যখন ভাব্‌ছে আমি অন্য একজন মানুষকে বিশ্বাস করছি, তখনও হয় ত সে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস করছে বলে ভাবাটা তার একটা ভ্রম!

পুষ্প বলিল, তাও হয় বই কি? তবে বিশ্বাসটা ত আর অমনি হয় না। একটা আত্মীয়তার গভীরতার উপর তার প্রতিষ্ঠা। তাই যাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে বলে ভাবা যায় সে বুঝ্‌তে পারে তার পরিমাণ ও গভীরতা কতখানি। এই যে আমি আর আপনি—আপনার কি মনে হয় না আমরা কেউ কারুকে বিশ্বাস করতে পারি?

দীপক প্রশ্ন করিল, কোন্ বিষয়ে?

পুষ্প বলিল, ধরুন, সব বিষয়ে।

দীপক উত্তর করিল, আমার মনে হয় পারি না।

পুষ্প তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমার ত' মনে হয় পারি। আর তা' পারি বলেই আমি আপনাকে আজ ডেকে বসিয়েছি। সকলকে হয় ত তা' করি না। আমারও ত নিজের সম্বন্ধে নিজের একটা দায়িত্ব আছে।

দীপক বলিল, এটা আর একটা বিশেষ কি কথা হোল?

পুষ্প বলিল, সে কথা, আপনি মেয়ে নন্, আপনি বুঝ্‌বেন না। নিমেষের ভূমিকম্পে বিরাট সৌধ ধুলিসাৎ হয়ে যায়। চক্ষের নিমেষে মানুষের মন চুরমার হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চিড় খেয়ে খেয়ে মানুষের মনে একটু আধটু ফাটা-ফুটো থাকেই, একটা কিছু ঘা খেলেই তা ভেঙ্গে পড়তে পারে; তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। তবে সে আঘাত সুখেরও হতে পারে, বেদনারও হতে পারে।

দীপক একটু থামিয়া গিয়া চিন্তিত ভাবে বলিল, কিন্তু আমি কি করি বল ত?

পুষ্প হাসিয়া বলিল, একটা বিয়ে করুন। এই না আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না!

দীপক বলিল, অন্তত এখন করছি। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার বন্ধুকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছিলাম।

পুষ্প জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার বন্ধু—সুষমা? কেন, কি হয়েছে?

দীপক বলিল, তুমি ত সবই জান। এ অবস্থায় কি করা যায়? আমার পথ কোন্ দিকে তা বুঝ্‌তে পারছি না।

দীপক থামিয়া গেল। পুষ্প বলিল, আমার কাছে পরামর্শ চান? বেশ। এ অবস্থায় আপনার দুটো পথ আছে। এক সুষমাদের সঙ্গেই মানিয়ে জুনিয়ে থাকা আর নয় ত আলাদা গিয়ে কোথাও বাস করা। কিন্তু আপনি তা পারবেন না। তাদের ছেড়ে গিয়ে আপনি শান্তি পাবেন না তা আমি জানি। আপনার যে রকম মন তাতে আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই ওদের কাছে থাকবেন বলে মেনে নিয়েছেন। আর সেটা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দরও হবে। এই যে আমি জানি, সুষমা আজ কাল আমাকে তেমন ভালবাসে না

আমি কি তা বলে তাকে উপেক্ষা করি? ভালকে সবাই ভালবাসে, মন্দকে কয়জন ভালবাস্‌তে পারে?

দীপক যেন নিরাশ্রয়ের মত বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার যে কি অশান্তি লাগে তা-তুমি বুঝ্‌তে পারবে না।

পুষ্প স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলিল, পারব না কেন? খুব পারি। বুঝি, আপনি ভাবছেন, আপনি একলা, আপনার কেন এ বন্ধন? আপনি কেন এ অশান্তিতে জড়িয়ে থেকে আপনার আদর্শ, আপনার মনের মহত্তর আকাঙ্খা-গুলিকে নষ্ট করেন। এই ত আপনার কথা? কিন্তু এ কথা ভেবে দেখেছেন কি, পরের উপকার করব এই কথাটা ভাবার মধ্যেও একটা অহঙ্কার আছে, একটা স্বার্থের আবরণ আছে? আমি মানুষের জন্য কিছু করছি এটুকু ভাবার মধ্যেও মানুষের যথেষ্ট অহঙ্কার থাকে। সেটা কি আপনার মনে নেই বলতে পারেন? সকলেরই থাকে, আপনারও আছে।

দীপক বলিল, আমার ত এ কথা কখনও মনে হয় নি। কোনও অহঙ্কারও ত মনে নেই।

পুষ্প উত্তর করিল, এখন হয় ত নেই, কিন্তু পরে ঐটেই বড় হয়! মানুষ তা টের পায় না। পেলে, অনেক মানুষই নিজের মনের কথা জেনে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ত! এই যে আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি এর ভেতর কি আমার কোনও স্বার্থ নাই? আছে।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, এতে আবার তোমার কি স্বার্থ থাক্‌তে পারে?

পুষ্প বলিল, আছে এবং সেটা আমি জানি। আপনার একটুও উপকারে এলাম এটুকু ভেবেই আমার আনন্দ। এই আনন্দটুকু পাবার লোভই আমার স্বার্থ!

দীপক হাসিয়া বলিল, তা হলে ত পৃথিবীতে সকল কাজ সকল কথার ভিতরই মানুষের স্বার্থ রয়েছে।

পুষ্প জোর করিয়া বলিল, নিশ্চয়। মানুষ নিজেকে যদি কিছুই দিতে না পারে তা হলে' তার বাঁচা চলে না। মানুষ যে দুঃখের দহনে পুড়ে মরে তার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে। সেটুকুই হয়ত তার জীবনের একমাত্র খোরাক্। তবু সেটুকুও স্বার্থ। তবে স্বার্থের আবার ভেদ আছে। মানুষের নিজের জীবন মানুষের কাছে যত স্বচ্ছ হয়ে আসে তত তার কাছে নিজের মনের সকল কথার সকলরূপ ধরা পড়ে।

দীপক এই কথাগুলি নিজের মনে অনেক বার ভাবিয়াছে। আজ পুষ্পর মুখে যেন তাহারই মনের কথা-গুলি স্পষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাই সে বালকের মত নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় ও আনন্দে পুষ্পর কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল।

দীপক ধীরে ধীরে ডাকিল, পুষ্প!

পুষ্প মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল, কি বলুন।

দীপক বলিল, যে কথাটা আমি বোঝাতে পারছি না, আমার ইচ্ছা করে সে কথাটা তুমি আপনা থেকেই বোঝ।

পুষ্প সহানুভূতির সুরে বলিল, তা কি পারা যায়? আমরা নিজের মনের কথাই অনেক বুঝ্‌তে পারি না। তবু আপনি যদি একটু ইঙ্গিতও দিতেন সে কথাটা কি, তাহলে আমি না হয় একবার চেষ্টা করতাম।

দীপক বলিল, যেখানে স্পষ্ট হওয়া অশোভন হয় না সেখানে আমি স্পষ্ট হতেই চাই। আভাস দিয়ে আমি জিনিষের মূল্য কমাতে চাই না। কিন্তু আমি তোমার কাছে কিছুই বলতে পারব না; তবু এমন হয় না যে, তুমি তা' সবখানি বুঝ্‌তে পারবে?

পুষ্প হাসিয়া বলিল, হয় ত আমিও এই কথাই ভাব্‌ছি যে, আপনি কেন বুঝে নিতে পারেন না আমি যা বল্‌তে চাই অথচ বল্‌তে পারি না? এটা খুব আশ্চর্য্য, না? আশ্চর্য্য হলেও আমার মনে হয় খুব স্বাভাবিক।

এমন সময় দরজা খুলিয়া ঢুকিলেন বেহারী বাবু আর তাঁর স্ত্রী। দীপককে দেখিয়া পুষ্পর মা বলিলেন, পুষ্পর যে এত খানি বুদ্ধি হয়েছে, দেখে আমার তবু আশা হোল। আমরা নেই বলে যে দীপককে ফিরিয়ে দাও নি তাই ভাল।

পুষ্প উত্তর করিল, আমার একটু দরকার না থাকলে হয় ত ফিরিয়ে দিতাম। উনি নিজেই ফিরে যাচ্ছিলেন, আমিই ডেকে রাখলাম।

বিহারী বাবুও সে ঘরে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, দীপককে দেখলেই তার মা'র কথা মনে পড়ে। সেই

সৌম্য শান্ত মুখখানা, সেই গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি। অল্পদিনের পরিচয়ে তাঁকে কি আপন মনে হয়েছিল!

পুষ্পর মা সায় দিয়া বলিলেন, জীবনে যেন দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। রুগ্ন শরীর তবু মানুষকে সেবা যত্ন করতে তাঁর কি আগ্রহ। শেষকালে সুষমা আর পুষ্পকে পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ!

দীপকের চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল, কোনও মতে চাপিয়া রাখিয়া বলিল, আমর মনে হয়, আমি শুধু আমার মাকে হারাই নি, আমার এক পরম বন্ধুকে হারিয়েছি। গোপন তাঁর কাছে কিছু থাকত না। আমার চলায়, কথায়, মুখের ছবির উপর যেন তিনি আমার মনের অবস্থা দেখতে পেতেন।

পুষ্প তখন বলিল, হয় ত আরও কেউ কেউও পায়। আপনি তা জানেন না।

বিহারী হাসিয়া বলিলেন, পুষ্পটা অতি বদ্ মেয়ে। দীপককে পেলেই ওর মাথায় যেন যত দুষ্ট বুদ্ধি চাপে।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দীপক বিদায় হইবার সময় বলিল, আমার একজন অতি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল আজ, অনেক দিন পরে সে এসেছে। সে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার চাইতে বয়সে একটু বড়, তবু আমাদের সঙ্গেই তার মেলামেশা ছিল এককালে সব চাইতে বেশি।

একটু থামিয়া আবার বলিল, সে খুব ভাল গাইতে পারে, একদিন নিয়ে আসব তাকে?

বিহারী গৃহিনীর দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, বেশ ত, নিয়ে এসো। তাঁর সঙ্গে গানের চর্চ্চাই না হয় করা যাবে একদিন!

পুষ্প তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, চর্চ্চা-টর্চ্চা যদি কর বাবা, তা হলে আর আমাদের ওর মধ্যে ডেকো না। শুধু গান শুনতে হয়, রাজী আছি।

কথা ঠিক হইয়া গেল, দীপক বিদায় লইল।

বাড়ীতে গিয়া দেখে ধীরুদা আপন মনে কি বকিয়া যাইতেছে। ঘরে আর কেউ নাই, বাতিটা কমান।

দীপক ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ধীরু-দা, কতক্ষণ ফিরেছ? একলা বসে কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

ধীরু বেশ গম্ভীর চালেই উত্তর করিল, একটু কবিত্ব করা যাচ্ছিল। কথা কইছিলাম প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে রাত্রির প্রকৃতিটার অবস্থা অনেকখানি মিলে যায়।

দীপক বলিল, মন্দ নয়, শোনা যাক্। যথা?

ধীরু বলিল, পেটে খিদে নেই ত? তা হলে হয় ত শুনতে মন্দ লাগবে না।

সন্ধ্যেবেলা অনেক খেয়ে এসেছি। আপাতত ভাবনা নেই। খাবার ত আমার ঢাকাই আছে-।

ধীরু গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিল, তবে বলি, শোন। কথাটা আমার সম্পূর্ণ নিজের অনুভূতির কথা। আগে হয় ত কবিরা এ কথা বহুবার বলে গেছেন, কিন্তু আমি তা পড়ি নি। এখন কথাটা হচ্ছে এই—মিলিয়ে দেখ, প্রকৃতির প্রভাত আর আমাদের ছেলেবেলাকার জীবন। পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, আলোয়, আনন্দে ভরা। তারপর কৈশোর—প্রকৃতির বুকে তখন একটু চঞ্চলতা, সূর্য্যের তেজ একটু বেড়েছে, জীবন-স্রোতের ঘন মর্ম্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

তারপর যৌবন—প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে তখন দুরন্ত রৌদ্রের খেলা। জলে স্থলে বৃক্ষ লতায় জীবন সঞ্চয়ের তাড়া পড়ে গেছে। শুধু পরিণতির দিকে সমগ্র পৃথিবীর বিপুল চেষ্টা। তারপর যৌবন সন্ধ্যা—আশায় আকাঙ্খায় প্রতিক্ষমান্ জীবন—অস্তরবির রেখা বিদায় নিয়ে যায়, বিদায় না দিয়ে উপায় নেই। পড়ন্ত রৌদ্রের সেই স্তব্ধ বিদায়ক্ষণ। তারপর রাত্রি—জীবনের পরিণত মুহূর্ত্ত—একা নিঃসঙ্গ রাত্রি—তার আপন মর্ম্মকথা আপনি বসে শোনে। প্রকৃতির এই আরতি, এই প্রস্তুতি। মানুষের জীবনের এই সন্ধিক্ষণ—সরল, নিরহঙ্কার; নিজের সঙ্গে নিজের এই নিষ্ঠুর পরিচয়। রাত্রি আর মানুষের মন বুঝি মুখোমুখি চেয়ে থাকে। খুব সুন্দর অথচ খুব একলা।

দীপক শ্রদ্ধাভরে শুনিয়া যাইতেছিল আর ভাবিতে ছিল, ধীরুদার মুখে এ কি কথা শুনি আজ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরু আবার বলিল, আমার নিজের কাছে নিজের জীবনের ইতিহাস বলছিলাম। প্রতি ছোট কথাটি পর্য্যন্ত। নিজের কানে নিজের কথা কেমন শোনায় তাই দেখ্‌ছিলাম।

দীপক এবার ধীরে ধীরে বলিল, কেন আজ তোমার মনটা এত ভারি হোল ধীরুদা?

ধীরু উত্তর করিল, ভারি নয়, অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে আস্‌ছে। নিজের কথা ত একদিনও ভাবি নি। ভাবতাম শুধু নিজের দেহের শক্তির কথা, বুদ্ধির কথা, মনের সাহসের কথা আর পরের কথা। আমার নিজের মধ্যে যে আবার একটা কেউ আছে তার খোঁজ কখনও করি নি।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, আজ করছ কেন?

ধীরু ভারি গলায় বলিল, আজ আমার বিশ্রামের দিন। হয় ত কাল আমাকে এমন জায়গায় ধরে নিয়ে যাবে যে, আমার আর মন বা শরীরের বিশ্রাম করবার আর অবসর হবে না।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কে, পুলিশ?

ধীরু অকুতোভয়ে উত্তর করিল, না তারা চেষ্টা করলেও পারবে না তা' আমি জানি। কিন্তু ধরে নিয়ে যাবে আমার এই এতদিনকার অভ্যাস, আমার নিজের এই হতাদরের জীবন। এর একটা নেশা আছে।

দীপক প্রশ্ন করিল, তবে যে তুমি আজই বল্‌ছিলে, এবার তুমি বস্‌বে, এবার থেকে স্থির হয়ে প্রাক্‌টিস্‌ করবে?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরু বলিল, দীপক, অতি শৈশব থেকে তোমাকে আমি চিনি। তোমাকে দেখে অবধি তোমাকে ভালবাসি। তাই তোমার কাছে মনের সত্য কথাটাই বলেছিলাম। বাইরের লোকের কাছে হয় ত আজও মনের এই ভ্রান্তির কথা বলব না। কিন্তু যা ভাবি তা পারি কই? গাছের থাকে মাটি, জলের থাকে আধার, গ্রহ নক্ষত্রের থাকে আকাশ, আমার কি আছে? এতদিন দিকে দিকে যে জয়ের রক্ত নিশান উড়িয়ে এসেছি, আজ জীবনের এই শ্রান্তির রাত্রে সেগুলি সব কালো দেখাচ্ছে। আজ কার মুখের দিকে চেয়ে আমার দৃষ্টি যাবে ফিরে, আমার লজ্জা যাবে ঘুচে, আমার সমস্ত জীবন শঙ্খধ্বনির মত বেজে উঠবে?—জয়ের ভেরী অনেক শুনেছি —আজ একবার চিরদিনের মত পরাজয়ের ধূলা-চন্দন ললাটে মাখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা কি সম্ভব!

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

দীপক তাহার হাতখানি ধরিল। ধীরু সম্মুখের ঐ বিস্তীর্ণ গভীর অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। পলক নাই, স্পন্দন নাই; গভীর স্বচ্ছ সে দৃষ্টি। থাকিয়া থাকিয়া অতি ধীরে দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে—যেন বিনিদ্র বনানীর পল্লব-মর্ম্মর।

দীপক তাহাকে ডাকিল, বলিল, ধীরু দা, তুমি এত কোমল হলে কেন? এ কি তোমার পরিবর্ত্তন? আজ তোমাকে একটুও ভাল লাগছে না। আগের চাইতে আজ তোমাকে দেখে বেশি ভয় করছে।

ধীরু উদাস গম্ভীর স্বরে বলিল, তলোয়ার যখন খাপে থাকে তখন তাতে বুক পেতে শোওয়া যায়। আজ আর আমাকে ভয় কিসের?

দীপক অবসর পাইয়া বলিল, ভয় ত সেই জন্যই বেশি। খাপের ভিতর আর তার মূল্য কতটুকু! একটা পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতির মত—মানুষকে বাঁচাতেও পারে না, মরতেও দেয় না।

ধীরু বলিল, বাঁশীটা আর ছোট তলোয়ারখানা আমার সঙ্গে বহুকাল থেকে আছে। কিন্তু দেখেছি, অসির যখন কাজ চলেছে তখন বাঁশীরও একটা নিঃশব্দ ক্রন্দন তার সঙ্গে মেশানো থাকত। এতদিনের কান্না আজ আমাকে এতখানি টেনে নিয়ে এসেছে। মানুষ যে কত অপদার্থ মনের ভেতরকার বাঁশীর সে কান্না যে শুনেছে সে বুঝতে পারে।

দীপক এবার ধীরুকে একটু অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। বলিল, তোমার বাঁশী আর তোমার গান একদিন একজনদের শোনাতে হবে। আমি তাঁদের বলে এসেছি। কালই সেখানে চল, ছুটি আছে আমার।

ধীরু বলিল, দেখ দীপক, অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন এমন কত কেটে গেছে, বনের পশুকে ভয় করি নি, সাপকে ভয় করি নি কিন্তু মানুষকে ভয় করেছি প্রতি মুহূর্ত্তে। ভয় করেছি দুই কারণে; এক ধরা পড়বার ভয়ে, আর এক মায়ার বাঁধনে পড়বার ভয়ে। বাঁশী তাই বনেও বাজাতে পারি নি, লোকালয়েও বাজাতে পারি নি। আজ এতদিন পরে কি আর সে বাঁশী বাজবে, না গলা দিয়ে সুর বেরুবে?

দীপক সস্নেহে বলিল, আমার ত খুব ভরসা যে সেখানে গেলে, তোমার প্রাণ এমন ভরে উঠবে যে, তোমার সুর ও স্বর দুই-ই অফুরন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

কি ভাবিয়া হঠাৎ ধীরু প্রশ্ন করিল, দীপক, তোমাকে ত জিজ্ঞাসা করি নি তোমার কি ভাবে দিন যাচ্ছে?

দীপক হাসিয়া উত্তর করিল, ধীরু-দা, হয় ত কয়েক দিন আগে আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমি বলতাম, দিনগুলো দুঃখে অশান্তিতেই যাচ্ছে। কিন্তু এই কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, আমরা যে পৃথিবীটাকে কল্পনার চক্ষে দেখি তাতে আর বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ পৃথিবীটাতে অনেক প্রভেদ। মানুষ সব চাইতে যার জন্য বেশি মাথা ঘামায় সে হচ্ছে মানুষেরই সুখ দুঃখের কথা নিয়ে। সেটাও খুব বড় কথা, কিন্তু তার আশে পাশে যে দু'চার দশজন মানুষ জীবনের বিচিত্র অবস্থায় চোখের সামনে ঘোরা ফেরা করে তাদের কথা ভাবাও ছোট কথা নয়—যদি সে পারে। আমার ত মনে হয় এখন, নিজের চারি পাশের ছোট সংসারটির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে শান্ত থাকাই সব চাইতে কঠিন আর সব চাইতে বড় কাজ।

ধীরু প্রশ্ন করিল, কেন এ কথা বলছ?

দীপক তেজদীপ্তস্বরে বলিল, সেটা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি বলে বলছি। কোথাও দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ হলে' তার জন্য দান ও সেবা চারিদিক থেকে আসে, সেখানে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আত্মপ্রসাদ, উন্মাদনা, খ্যাতির সম্ভাবনা অনেক কিছু থাকে, আর সাহায্য করবার সুবিধাও অনেকখানি পাওয়া যায় কিন্তু একটি নিরন্ন পরিবারে যদি বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ চল্‌তে থাকে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার আয়োজন যেমন অপ্রতুল, একলা ঐটুকু সীমাবদ্ধ অভাবের পীড়নের সঙ্গে পেরে ওঠাও তেমনি কঠিন হয়। এখানে খ্যাতি নেই, যশ নেই, লোকবল নেই;—দুর্গমতার মধ্যে নিত্য নূতন পথ কেটে একটু করে আলোরৌদ্রকে কোনও মতে ঘরে আনা। আশাও কম, উপায়ও কম।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া কাটিয়া গেল। বাইরে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার। গাছের পাতা হাওয়ার তাড়ায় মাঝে মাঝে টুপ টাপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, পাখীর ডানার ঝাপটা, দু' একটা কুকুরের চলাফেরা—এই বিচ্ছিন্ন শব্দগুলি রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর করিয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে গা শিহরিয়া ওঠে।

মন যখন ছুটিতে থাকে, তখন কাছের জিনিষ পিছে পড়িয়া থাকে। প্রসাদ আসিয়া সে অন্ধকারে কখন দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। তবে তাহার নিঃশ্বাস বড় জোরে পড়িতেছিল, তাই যেন চমক ভাঙ্গিয়া দীপক প্রশ্ন করিল, কে?

প্রসাদ ধীরে উত্তর করিল, আমি প্রসাদ।

দীপক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রসাদ, আজ কেমন আছে? একেবারে ভুলে গেছি, সন্ধ্যেবেলা খবরটাও নিতে পারি নি।

কঠিন অথচ আর্দ্রস্বরে প্রসাদ বলিল, সন্ধ্যের একটু পরেই শেষ হয়ে গেছে দাদাবাবু।

দীপক শুধু একটা শব্দ করিল, হুঁ।

প্রসাদ নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিল, সে ভাবনা থাক্ দাদাবাবু। কিন্তু এখন মড়া যে ঘরে পড়ে আছে। আজ রাত্রেই যদি দাহ না হয় তবে যে কাল সকালে এ কথা আর চাপা থাক্‌বে না। মালাকে তাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে মুখ টিপে তার কান্না বন্ধ করে এসেছি।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের, বাড়ীতে কেউ—

প্রসাদ বলিল, না দাদাবাবু, তাঁদেরও খবর দিই নি। নিঃশ্বাসটা শেষ হয় খুব আস্তে, তা ত আর কেউ জান্‌তে পারে না।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, খবর দিয়েছ লোকজনকে?

প্রসাদ মুখে একটা নিরাশার বিকৃত আওয়াজ করিয়া বলিল, কি হবে খবর দিয়ে, তারা কেউ আসবে না। মালাকে এতদিন কেন বিয়ে দিই নি, এই আমার অপরাধ। কিন্তু দিলে বাবু কে একে দেখ্‌ত! আমি ত সারাদিনটাই হাটে বাজারে থাকি।—তারা কেউ মড়া ছোঁবে না, আসবে না, তা আমি জানি।

দীপক বলিল, আমরা ছুঁলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?

প্রসাদ এবার ভারি গলায় বলিল, সব গরীবের এক জাত দাদাবাবু। জ্যান্তেও তাদের কেউ ছোঁয় না, মরলেও কেউ ছোঁয় না। আপনারা ছোঁবেন—

দীপক তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া ধীরুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ধীরু-দা পারব না আমরা দুজনে?

ধীরু কিছু উত্তর করিল না, শুধু উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

প্রসাদ সঙ্কোচে বলিল, আর একটি লোক না হলে আপনাদের বড় কষ্ট হবে দাদাবাবু, অনেকটা দূর। একটু হাত বদ্‌লানও ত চাই। কাছে হলে তিন জনেই খুব।

দীপক কি একটু ভাবিল। হঠাৎ বলিল, প্রসাদ তুমি ধীরুদাকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে; যোগাড়যন্ত্র করগে, আমি এখুনি আস্‌ছি।

তিনজনেই একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। সেই গভীর অন্ধকারে দীপক কোথায় মিলাইয়া গেল।

প্রসাদ ও ধীরু যাইয়া বাঁধাবাঁধি প্রায় সব শেষ করিল। প্রসাদ বলিল, এমনটি হবে জেনেই আমি আগে থেকেই অনেকটা জোগাড় করে রেখেছিলাম।

আধঘন্টার মধ্যেই দীপক কল্যাণকে সঙ্গে করিয়া আসিল। মালা একবার কাঁদিয়া উঠিতেই প্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, আজকের রাতটা কোনও মতে মুখে কাপড় গুঁজে কাটিয়ে দে মা—কাল থেকে যত পারিস্‌ কাঁদিস্‌।

চারজনে ত মৃতদেহ লইয়া বাহির হইল। দীপক বলিল, মালা?

প্রসাদ ফিরিয়া বলিল, দরজাটা আগল দিয়ে দে মা। এই ত আমরা ভোর না হতে ফিরে আস্‌ছি—আর ঐ বড় দা' খানা রইল।

মৃতদেহ লইয়া তাহারা চলিল। মালা ঝাঁপাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

কল্যাণ একবার ফিরিয়া চাহিল। প্রসাদ তাহাকে বলিল, ও দেখ্‌বেন না পাগ্‌লাদাদা। এগিয়ে চলুন, অন্ধকার থাকতে আমাদের ফিরতে হবে।

—ক্রমশ

এলো শীত ঘিরে কুয়াশায়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

এলো শীত ঘিরে কুয়াশায় ;
বরণের ব্যবসায়,
পড়ে গেল ছাই,
ধূসরের অধিকার, লাল, নীল, নাহি আর
ম্লান মুখে ধরা কাঁদে তাই।
সবুজের বসবাস, ছিল যেথা বারোমাস,
আজ সেই দেবদারু দীন,
খালি গায়ে হিমবায়ে কাঁপে সারা দিন।

নেড়াগাছ, যেন ভাঙা খাঁচা
পরাণ পাখীটি কাঁচা
সবুজ পাখায়
উড়ে গেছে কোন্ দেশে, কুলায়ের অবশেষ
পড়ে শুধু করে হায়, হায়।
ডালা পালা বাঁকা চোরা, শুকান বাকলে মোড়া
ঝড়ে উড়ে চলে যাবে বলে'
দিন নাই, রাত নাই, অনিবার দোলে।

ফুলবন আজিকে উজাড়,
ঝুমকো ফুলের ঝাড়,
দোলে না সোহাগে,
কামিনী সে অভিমানে, চলে গেছে কোন্ খানে
কাঞ্চন, প্রবাসী তার আগে।

মাধবী, মালতী, বেলা, চলে গেছে ভেঙে খেলা,
উদাসিনী হয়েছে পারুল,
ফোটে না তাম্বুল রাগ দাড়িম্বের ফুল!

পলাসের অনল কোথায়?
গোলাপের আলতায়,
ধুইল শিশিরে,
সোনার বরণ চাঁপা, পাতার তলায় চাপা
একে একে মরে গেল কি রে?
বর্ণে, গন্ধে, প্রাণ-ভরা ললাটে চন্দন পরা'
করবীরা নিয়েছে বিদায়;
কুসুম ফুলের রং আর না বিকায়।

কেমন করে লিখতে শিখি

সেল্মা ল্যাগার্লফ্

অনুবাদক—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৮৬ সাল। তখন শরৎকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধ্যার পর আলো জ্বেলে আমার স্কুলের ছাত্রীদের খাতা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় ডাক-পিয়ন এসে চিঠির বাক্সে খানকয়েক চিঠি দিয়ে গেল। বাড়ীতে তখন আমি একা, তাই তাড়াতাড়ি দেউড়িতে ডাক দেখতে গেলাম। দেখলাম আমার নামে একখানা চিঠি রয়েছে—প্রকাণ্ড লেফাপা, ডাকঘরের শিল রয়েছে ষ্টক্‌হল্মের। চিঠিখানা পড়লাম। লাইন কয়েক পড়বার পরই আমার হাত কাঁপতে লাগল, চিঠির অক্ষরগুলি যেন আমার চোখের সুমুখে নৃত্য শুরু করে দিল। একবার চিঠি থেকে চোখ দুটি টেবিলের উপকার নীল মলাটের খাতাগুলির উপর নিবদ্ধ হল। খাতাগুলি জড় করে দূরে ফেলে দিলাম। তারপর আর একবার চিঠিখানা পড়তে বসে গেলাম।

ল্যাণ্ডস্ক্রোনার মেয়ে-স্কুলে বছর দেড়েক শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছি, এবং সত্যি বলতে কি সেখানে আমার মোটেই ভাল লাগে নি। কাজ আমার বেশ ভালই লেগেছিল, স্কুলের অধ্যক্ষ বা সহকর্মিনীদের সঙ্গেও বেশ

বনিবনাও হত, ছোট্ট সুন্দর শহরটিও আমার বেশ ভালই লেগেছিল, যে পরিবারে আমি ছিলাম তাঁরাও আমায় তাঁদের বাড়ীর মেয়ের মতই দেখতেন। তবু প্রাণ কি যেন একটা চায়, প্রাণের সে চাঞ্চল্য যেন কিছুতেই দূর হতে চাইছিল না—জীবনধারা যে ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তাতে প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, কি যেন তার চাই, কি যেন সে পায় নি।

সাত বছর বয়স থেকেই সাহিত্যিক হবার আগ্রহ জাগে। পনর বছর বয়সেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করি এবং এককালে যে আমি একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা হবই ইহাই ছিল আমার আশা। কিন্তু সারাটা কৈশোর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কথাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল যে, জীবনের উনত্রিশ বছর ত কেটে গেল, কৈ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কোন লক্ষণই ত দেখা যাচ্ছে না। বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে আমার আদর্শ জীবনধারার আকাশপাতাল প্রভেদই আমার নজরে পড়ল। যৌবনের প্রারম্ভে যতটা সম্ভাবনা ছিল, আজ তার কিছুই নেই। পূর্ব্বে যখন ছোট ভাই-বোনদের পড়াবার জন্যে আমাদের পল্লী-আবাসে বাস করছিলাম তখন, তারপর ছাত্রজীবনেও আমার ভাবগুলিকে মাঝে মাঝে ছন্দে গেঁথে রাখতাম। সনেট লেখায় আমার বেশ হাত ছিল এবং সনেট লিখতে আমাকে বেশী বেগও পেতে হত না। আমার সনেটগুলি যে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন এ কথা ভাবতেও আমার সাহসে কুলোয় নি। তবে সেগুলি রচনা করতে আমার এতটুকু ভাবতে হয় নি, আপনা থেকেই তা কলমের ডগা দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে বেরিয়ে এসেচে। সনেটগুলিকে ছন্দে গেঁথে তুলে আমার কর্ম্মক্লান্ত অন্তরে একটা বিপুল তৃপ্তি, একটা স্বস্তি এসে যেত। আর সেই কারণে এটাই হল আমার একটা প্রিয় বিলাস। সেই সময় আমার নিজের উপর খুব বড় বেশী দাবী ছিল না, কিন্তু গ্রন্থকার হওয়াটা যে একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয় তাই আমার মনে হত। এ কথাও আমার মনে ছিল যে, একদিন শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে একান্ত ভাবে যদি সাহিত্যের চর্চ্চাতেই শক্তি ও সময় নিয়োগ করি তাহলে সত্যিকারের সাহিত্য-সৃষ্টি করবার প্রেরণা আমার মধ্যে আসবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমেই লেখা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যে আমি একদিন অবলীলাক্রমে সনেটের পর সনেট লিখে গেছি, এতটুকু ভাবতে হয় নি, সেই আমাকেই এখন একটা সনেট শেষ করতে সপ্তাহ কেটে যায়।

বছর কয়েক আগেই, ভার্মল্যাণ্ডের ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে লিখবার আগ্রহ জন্মে; কাব্যের মধ্য দিয়েই তা লিখব মনে করেছিলুম, কিন্তু কাজে তা মোটেই এগোয় নি। এই অসঙ্গত বিলম্ব ও অক্ষমতার দৈন্য আমার শক্তির উপর সন্দেহ এনে দিল। অথচ লেখক হবার আগ্রহও ছিল অত্যন্ত প্রবল; তা বলে এ সত্যও আমার জানা ছিল যে, তাতে আমায় জাহান্নামেও নিয়ে যেতে পারে।

সে যুগে যে সব সামাজিক সমস্যা সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল, সেই সব বিষয়ই আমায় সেদিন একান্তভাবে পেয়ে বসেছিল। শিক্ষা, শাস্তি, পানদোষ নিবারণ, নারী-সমস্যা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা—সবাই আমার প্রাণে এসে একে একে ধাক্কা দিত। শিক্ষাদানকেই পেশারূপে গ্রহণ করেছিলাম, তবে সেই সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষাও বদ্ধমূল ছিল যে, এমন একটি আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে, যাতে সম-সাময়িক শিক্ষাদানরীতির ত্রুটি বিচ্যুতি মোটেই থাকবে না। কিন্তু তবু এই মনোভাবের অন্তরালে সাহিত্য-চর্চ্চা উঁকি ঝুঁকি দিতে ছাড়ত না। কিন্তু শক্তি যদি আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ না হয় তাহলে আদর্শ অনুযায়ী জীবন কেমন করে গড়ে তুলব!

১৮৮৬ সালের শরৎকালে অক্ষমতার গ্লানি যখন আমায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিরাশ করে তুলেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নারী-আন্দোলনের নেত্রী, ও Dagny পত্রের সম্পাদিকা Baroness Asselde Adlersparre-র কাছ থেকে ছোট্ট একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিতে কয়েক ছত্র মাত্র লেখা, আমাদের স্কুলের কোন এক সহযোগিনী আমার লেখা গুটি চারেক সনেট তাঁকে দেখিয়েছেন এবং আরো কয়েকটি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছেন, কেননা "Dagnyতে" তিনি আমার সনেট ছাপাতে চেষ্টা করবেন।

আমার লেখা প্রকাশের জন্য বন্ধুর এই চেষ্টা আমার মনে লাগল কিন্তু চিঠিখানায় উৎসাহের তেমন আভাষ পাওয়া গেল না। চিঠিখানার ভাষা নেহাতই যেন জলো গোছের। সে যাই হোক, কতকগুলি সনেট ষ্টক্‌হলমে পাঠিয়ে দিলাম বটে কিন্তু আশাকে আমার জাগতে দিলাম না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, কোন জবাব পেলাম না। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর যখন জবাব এল তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না—এ যে নেহাতই অপ্রত্যাশিত। Esselde লিখেছেন যে, আমার সনেটগুলি একজন বিশিষ্ট গুণীর দ্বারা পড়িয়েছেন, তাঁর মতে সনেটগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্ট সনেটের সকল গুণই রয়েছে। এগুলি বেশ সুস্পষ্ট, সূক্ষ্ম এবং এক কথায় এগুলি সুদৃশ্য উজ্জ্বল হীরকের মত। এগুলি তিনি তাঁর Dagnyএ প্রকাশ করবেন স্থির করেছেন এবং প্রথম চারটি আসছে সংখ্যার কাগজেই বার হবে। তিনি আরো জানতে চেয়েছেন যে, সনেট ছাড়া আমি আর কিছু লিখছি কিনা এবং তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় হওয়ার আশায় বড়দিনের ছুটিতে ষ্টক্‌হল্‌মে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। শেষের এই দু-তিন ছত্র বার বার পড়ে ঘরের আলো নিভিয়ে ঘরের কোণে সোফায় বসে এই কথাটাই কেবল নিজেকে বোঝাতে চাইছিলাম যে, আমার সনেট সত্য সত্যই ছাপা হবে, যে আমার সনেট—"সুস্পষ্ট" এবং যে, শেষটায় আমায় সাহিত্যিকই হতে হল।

এত আনন্দের মধ্যেও আমায় যিনি চিঠি লিখেছেন তাঁকে ভুলতে পারলাম না, তাঁর সম্বন্ধে নানা উঁচু ভাবই আমার মনে এল। গুটি কয়েক সনেট পড়েই যে মহিলা এক সম্পূর্ণ অচেনাকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করতে পারেন তিনি কি রকম লোক! হঠাৎ কোন কাজ করবার মত মানসিক বল তাঁর যে যথেষ্টই আছে তার সন্ধান পেয়ে শ্রদ্ধায় আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল। কী দুর্জ্জয় দুঃসাহস, কী অসীম স্নেহপ্রীতিভরা মহৎ হৃদয়! মাস খানেক বাদে, ১৮৮৭ সালের প্রথম দিয়ে আমি Esselde-র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ষ্টক্‌হল্‌মে যাত্রা করলাম। দশটার সময় ষ্টক্‌হল্‌ম ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, কিন্তু দেখলাম কেউ আমায় অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে উপস্থিত নেই। অগত্যা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে কোচোয়ানকে ঠিকানা বলে গাড়ীতে উঠে বসলাম। লোকটির রাস্তাটির নাম জানা ছিল না, তাই প্রথমটা সে একটু ইতস্তত করলে কিন্তু পাশ থেকে আর একজন কোচোয়ান আমার অবোধ্য ভাষায় তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে কি দুচারটি কথা বল্লে। গাড়ী ছেড়ে দিলে। পথের যেন আর শেষ নেই, মাঝে মাঝে গাড়ীর জানলার খড়খড়ি তুলে কোথায় যাচ্ছি দেখতে লাগলাম, কেননা কোচোয়ান যে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমার জানা ছিল না, প্রায় ঘণ্টা খানেক চললাম। তখন আমার মনে হল Esselde সত্যি সত্যিই সেই ঠিকানায় আছেন কিনা, এত দেরীতে গিয়ে তাঁর নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা হবে।

অবশেষে আমাদের গাড়ী এক সরু বাঁকা গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। এবং গাড়ী থেকে নেমে দেখলাম, সামনে ত কোন বাড়ী নেই, আছে সুবৃহৎ এক দেয়াল, তাতে একটিও জানলা নেই। কোচোয়ান একটা ছোট দরজা দেখিয়ে দিলে, আমি কড়া ধরে নাড়তেই কে একজন এসে দ্বার খুলে দিল মনে হল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। সামনেই প্রকাণ্ড একটা বাড়ী, অন্ধকার, কোন্ পথে যাব, স্থির করতে পারছিলাম না। একটু পরে দেখতে পেলাম খাড়া এক সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে, যেন একখানা মই। কি করব স্থির করতে পারছিলাম না, এমন সময় সিঁড়ির উপরকার দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আলো এসে পড়ল। লম্বা ছিপ্‌ছিপে সুদৃশ্য পোশাক পরা একটি মেয়ে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমিই ফ্রাউলিন ল্যাগার্‌লফ্ কিনা। ভুল ঠিকানায় এসে পড়ি নি জেনে ভারী খুশী হলাম। বাড়ীর লোকজন এখনো সকলে ঘুমোয়নি তা হলে!

সে যাই হোক, সেদিন আর ব্যরনেস-এর সঙ্গে দেখা হল না, তাঁর শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। তবে তাঁর সেক্রেটারী ফ্রাউলিন মেম্‌স্ ও সেই লম্বা মেয়েটি-আলবার্টিনা—আমার অভ্যর্থনা করলেন।

খেতে দিলেন এবং শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরখানা নেহাতই ছোট, তাতে একখানা ছোট্ট লোহার খাট, তাতে পুরো গদী, ঘরখানা সিঁড়ির ঠিক পাশেই। শুয়ে শুয়ে পরের দিন কি হবে না হবে, ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আমার মনে বেশ তৃপ্তিই ছিল। পর দিন ঘুম থেকে জেগে কাপড়চোপড় ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। যে ঘরে কাল রাত্রিতে গিয়ে ছিলাম এ সেই ঘর, অন্ধকারে ভাল ভাল করে ঘরখানার কিছু দেখবার সুযোগ পাই নি।

এই ঘর থেকে যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে ফাঁকা, যেন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির শোভা দেখছি, দৃষ্টি এতটুকু ব্যহত হয় না। ঘরে তখন কেউ ছিল না, এক জানলা থেকে আর এক জানলায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম। চারদিকেই দিগন্ত প্রসারিত প্রাকৃতিক শোভা। আমার মনে হয় সারা ষ্টক্‌হল্‌মে এ রকম আর একখানা বাড়ীও নেই। দূরে সারি সারি বাড়ীগুলি, তার বিভিন্ন গঠন, তার চিমনি—সে এক অপূর্ব্ব শোভা। এইখানে যিনি বাস করেন, তাঁর পক্ষে হাজার হাজার নর-নারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করাটা নেহাৎ অসঙ্গত নয়। বাইরে যেমন প্রাকৃতিক শোভা, ঘরের মধ্যেও তেমনি দেয়ালে দেয়ালে বহু ইতালীয় চিত্রকরদের বিখ্যাত ছবি টাঙানো রয়েছে, সুন্দর সুন্দর প্রাচীন আমলের আসবাব পত্র; কিন্তু আমায় সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করল ঘরের এককোণের এক প্রকাণ্ড টেবিল, তার অতি বৃহৎ সোফাখানা। এই টেবিলে বহুলোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। টেবিলে উপর অসংখ্য বই সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, প্রুফ ইত্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী এশেলদে এই টেবিলে বসেই কাজ করেন।

টেবিলের সমুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। জীবনে এই প্রথম গ্রন্থকারের বাড়ীতে আমার পদার্পণ। এই কথা ভাবতেই মনটা আমার পুলকিত হয়ে উঠল। এখানে লেখাও চলে, তা নিয়ে আলোচনাও হয়, তারপর তা ছাপাখানায় গিয়ে কম্পোজ হয়ে প্রুফ আসে, সেগুলি সংশোধনও হয়। এইখানে এমন একজন বাস করেন যিনি বইপত্রের মধ্যেই ডুবে আছেন। চারিদিকেই তাঁর বই-পুথি, এমনি ধারা জীবনই যে আমার জীবনের কাম্য।

একটু পরেই সেক্রেটারী এসে আমায় বল্লেন যে, ব্যারনেশ এখনো শুয়ে আছেন এবং আজও আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। এই সংবাদে আমার নিরাশ হবারই কথা, কিন্তু পরীক্ষার্থী যেমন পরীক্ষাকে ভয় পায় আমিও শ্রীমতী এশেলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তেমনি ভয় পাচ্ছিলাম। তাই হৃষ্টচিত্তে জামাকাপড় পরে দু'একজন পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে শহরে বার হয়ে পড়লাম; মিস্ আলবার্টিনা আমায় রাস্তাঘাটের নির্দ্দেশ করে দিলেন। পর দিন সকালেও ব্যারনেশের অফিস ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম—কেউ নেই। একটু পরেই শুনলাম, সেদিনও শ্রীমতী এশেলদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তৃতীয় দিন সকালে যখন আমি সেই ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন সোফায় বসা এক বৃদ্ধ মহিলা হাত বাড়িয়ে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করলেন। এর পূর্ব্বেও আর একবার আমি শ্রীমতী এশেলদেকে দেখেছিলাম, তখন তিনি সাজ-পোষাক করে গীর্জ্জায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

মনে হল তাঁর বাড়ীতে তিনি কি নিদারুণ অসহায়! এর হাত এড়াবার জন্যে তিনি জীবনভর কত না চেষ্টা করে আসছেন। হাত দুখানা তাঁর সরু সরু এবং বেশ কোমল, চুলগুলি রোমান যুগের ফ্যাসানে গুচ্ছ করে করে পাকান এবং আকৃতি দেখে মনে হয় তাঁর দেহ যেন তাঁকে আর বহন করে রাখতে পারছে না। মুখখানা সুন্দর কিছুতেই বলা যেতে পারে না, বিশেষত সদ্য অসুখ থেকে উঠে তাঁর নিস্তেজ ভাব ও অসুস্থতা দেখা যাচ্ছিল।

এই ছোট্ট মানুষটি যা কিছু করেছেন তা তাঁর এই দৈহিক শক্তির জোরে নয়, তাঁর মধ্যে যে একটা অসাধারণ মনীষা ও চরিত্র ছিল তারই বলে। তাঁর অন্তরের শক্তি ও সৌন্দর্য্য-পরিমাপের একটি মাত্র উপায় ছিল, আর তা হচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বর। খুব নীচু গলায় কথা বলতেন বটে কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত মিষ্টি। প্রত্যেকটি

শব্দ সুস্পষ্ট এবং তাতে একটা মুরুব্বির সুর বেজে উঠত বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাতে হাসিঠাট্টার প্রাচুর্য্যও এতটা পাওয়া যেত যে, সময় সময় ঠিক অবস্থাটা মালুম করা শক্ত হয়ে উঠত।

কি নিয়ে কথা শুরু করব তাই হল সমস্যা। প্রথমটায় সাদর সম্ভাষণ শেষ করে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কথা আরম্ভ হল। ১৮৮৫ সাল থেকে তিনি ছিলেন বালিকা-বিদ্যালয়ে কমিটির অন্যতম সদস্য। এ পর্য্যন্ত বহু ইস্কুলই তাঁকে পরিদর্শন করতে হয়েছে এবং সে কারণে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। অন্তত আমার ত তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন আসলে একজন চিন্তাশীল মহিলা, কাজেই যে বিষয়ের আলোচনায় আমার মনের জড়তা কেটে যাবে, আলোচনাটা সেই দিকেই নিয়ন্ত্রিত করলেন এবং এমনি করে আমার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠবার সুযোগ করে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া হতেই (ব্রেক ফাষ্ট) তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে কোন একটা কাজের জন্যে দূরে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার উপর কয়েকটি কবিতা পাঠ করবার হুকুম হল, সনেট নয়। অবস্থা সঙ্গীন। কিছু না ভেবেচিন্তে আমার একটি কবিতা পাঠ করতে শুরু করে দিলাম। মুহূর্ত্ত কয়েক যেতে না যেতেই তিনি হাত বাড়িয়ে কবিতাটি নিজের কাগজপত্রের মধ্যে রেখে দিলেন। এবং বল্লেন,

'একবার সুইডিস য়্যাকাডেমীতে একটা কবিতা পড়তে গিয়ে টেগ্‌নার-এর (Tegner) কি হয়েছিল জান?'

'না, শুনি নি ত আমি।'

'তবে শোন। তিনি যখন চেঁচিয়ে কবিতাটি পড়ছিলেন তখন বিশপ উইলিয়ম হাত বাড়িয়ে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি কেড়ে নেন এবং তাঁর সেই সিংহের মত কণ্ঠস্বর নিয়ে কবিতাটি পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। ফলে কবিতাটির অর্থই আলাদা শুনাল, এবং তাতেই ছিল কবিতাটির সৌন্দর্য্য ও মহনীয়তা। ভাল করে কবিতা পড়তে তোমায় শিখতে হবে, নইলে উইলিয়ম যা করেছিলেন আমাকেও তাই করতে হবে।'

ইহা আমার ত্রুটি-সংশোধন ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু তাতেই আমি ভারী খুশী হলাম, কেননা আমার সঙ্গে টেগ্‌নারের তুলনা! আমি হাসতে হাসতে বল্লাম,

'টেগ্‌নার নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলেন।'

তিনি জবাব দিলেন, 'তা হবে। তাঁর হকচকিয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু আমাকে ভয় পাবার ত তোমার কোনই কারণ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই পড় না।'

বলা বাহুল্য, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি তাঁর মায়া প্রভাবে তাঁর বশীভূত হয়ে পড়লাম। পড়া শুনতে শুনতে সেই প্রভাবই তিনি আমার উপর প্রয়োগ করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই কবিতাটি পাঠ করছিলাম এবং পড়া বেশ ভালই হল। তিনি সোফায় বসে নীরবে শুনে গেলেন মাত্র—সূক্ষ্ম সহানুভূতির জাল দিয়ে আমায় বেঁধে ফেল্লেন। নিজের কবিতাই নিজের কাছে এমন সুন্দর মনে হল যে, কবিতাটির সুর যেন আরো ঢের চড়া, তার অর্থ যেন আরো গভীরতর। যা ছিল জটিল ও অস্পষ্ট, তা হয়ে পড়ল সরল ও সহজ। বুঝলাম শ্রোতা খুব খুশী হয়েছেন। এই কবিতাটি ও আর একটি কবিতা পর পর Dagny-তে বার হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর আরো বল্লেন, 'আরো একটা কথা তোমায় বলতে চাই মিস ল্যাগারলফ্‌। আমার মনে হয়, আমরা ভবিষ্যতে একযোগে চলবার জন্যই যেন জন্মেছি। তোমায় আমি বুঝতে পেরেছি এবং তোমার মেজাজও ঠিক চিনেছি। তোমার লেখায় আমার মধ্যে একটা স্বতস্ফূর্ত্ত প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা দরদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার লেখা সম্বন্ধে আমি যোগ্য বিচার করতে পারব কি না সন্দেহ আছে, কাজেই আমার মতামতের উপর তুমি খুব বেশী নির্ভর করো না। যে লেখায় আমার চোখে কোন ত্রুটিই ধরা পড়ে না, হয় ত অন্যের চোখে তাতে বহু ত্রুটিই ধরা পড়বে। তোমার লেখার সম্বন্ধে আমার বিচার কিছুতেই নির্ভুল হবে না।

ইহা গুণমুগ্ধ সমালোচকের একটি চমৎকার স্বীকারোক্তি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমি তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম। এবং তাঁকে জানালাম যে, যত দিন তিনি আমার

লেখা পড়ে খুশী থাকবেন ততদিন অন্যের সমালোচনাকে আমি থোড়াই কেয়ার্ করি।

এইখানেই সেদিনকার মত আমাদের আলাপ শেষ হল। এশেলদেও উঠে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। আর আমিও অভ্যাসবশে সারা পথ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বার হয়ে পড়লাম।

সে যাত্রায় আরো দিন কয়েক ষ্টক্হল্মে ছিলাম এবং এশেলদের যে আমার উপর কতটা মায়া প্রভাব বিস্তার করেছেন তা বুঝতে একটু সময়ও লেগেছিল। তাঁর বৈঠকখানায় বসে সারা সকালটা আমরা কথাবার্ত্তায় কাটিয়ে দিতাম। এই বিদুষী নারীর সঙ্গে আলাপ করাটা আমার বুভুক্ষু আত্মার অমৃত আহার্য্য বলে মনে করি। আমি এ কথা বিশ্বাস করতে চাই যে, তিনি কেবলমাত্র আমার কবিতার জন্যই আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন না, আমাকেও তিনি যথেষ্ট ভালবেসে ছিলেন তিনি স্বভাবতই দুর্ব্বল ও অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত থাকতেন; তাহলেও যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাঁদের সকলকার দিকে একান্ত নজর রাখতেন। কারুর কথায় বা তাঁর বাক্যবাণের ঝড় বয়ে যেত, আবার কারুর কথায় তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে চুপ করে যেতেন। আমার সঙ্গে কিন্তু তিনি চমৎকার স্বাভাবিক হয়ে যান, এবং মন খুলে সবকিছু আলাপসালাপ করেন। যে বিদুষী রমণী Zeitschrift fiirs Heim এবং Dagny পত্রে অত সব গম্ভীর বিষয়ে ও বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি যে ব্যক্তিগত জীবনেও ঠাট্টা বিদ্রূপের মশলা সঞ্চয় করতে পেরেছেন এটা সত্যই আশ্চর্য্য।

একদিনের কথা কখনো ভুলবো না। আমি তাঁর সামনে বসে আছি। এমন সময় তাঁর ডাকে চিঠিপত্র এল। তার মধ্যে একখানা রঙচঙে কাগজও ছিল।

আমি বলে উঠলাম, 'এ নিশ্চয় ভুল করে আপনার কাছে এসেছে, নতুবা কাগজ-ওয়ালারা কি মনে করে যে পক্ষীতত্বেও আপনার অনুরাগ আছে?'

তিনি বার কতক অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন, 'জান, এই কাগজখানা আর আমার Dagny সমসাময়িক। কোন্ খানা বেশীদিন টিকে তাজানবার জন্যেই আমি এর গ্রাহক হয়েছি।'

যতই দিন যেতে লাগল এবং আমি যতই ষ্টক্হল্মে যাতায়াত শুরু করলাম, ততই লোকের সঙ্গে আমার জানা-শুনা হতে লাগল। শ্রীমতী এশেলদেকে চেনে এমন লোকের সঙ্গেও চেনা হল। তাঁরা সকলেই আমায় সাবধান করে দিতে লাগলেন। ওঁর অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা, ওঁর উচ্চাদর্শ, ওঁর নতুন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি ওঁর নেতৃত্ব করবার অদ্ভুত যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই এক মত, কিন্তু তাঁরা সকলেই আমায় এই উপদেশ দিলেন যে, নিজেকে একেবারে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ো না, তাহলে তিনি সেই সুযোগে তাঁর নারী আন্দোলনের কাজে তোমায় খাটিয়ে নেবেন। আমরা স্বাধীন থাকতে চাই, তাঁরা বললেন, উনি আমাদের সকলকার কর্ম্মশক্তিকে নিজের কাজে খাটাতে চাইছেন।

যাঁরা নারী-আন্দোলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই অভিযোগ করলেন যে, এশেলদের নিজেকেই সকলকার প্রধান করবার দিকে একটা ঝোঁক আছে এবং এই জন্য তিনি অন্যের যোগ্যতাকে কখনো স্বীকার করেন না। তিনি খাঁটি স্বৈরাচারী, তাঁর নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্যেরও যে ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে, তা যেন জানেনই না এবং নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা কেউ শোনে এটাও তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না।

এই সব সাবধানবাণী এবং অভিযোগ হয় ত কতক অংশে সত্যি; কিন্তু অপর পক্ষে যে ক্ষুদ্রকায় মহিলাটি জ্ঞানে মনীষায় সকলকার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যে শ্রেষ্ঠ সে কথা সকলেই যখন স্বীকার করেছেন তখন এহেন মহিলার আদেশ নীরবে নতমস্তকে পালন করা হবে না কেন, তা কিন্তু আমি আজো বুঝতে পারি নি! তাঁরা কেন নিজেদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে ওঁর বিরাট শক্তির কাছে মাথা নীচু করবেন না? তাতে ত নিজেদেরই কল্যাণ সাধিত হবে। এই সব অভিযোগের কথা কিন্তু যখন ওঁর ঘরে বসে ওঁর কথা বার্ত্তা শুনেছি তখন আদপেই মনে হয় নি! তিনি তাঁর প্রতিভার যাদু-

আমার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সে সহায়তা যেন তাঁর সে বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে একান্ত নগণ্য ও নিষ্প্রভ বলে মনে হত। এই সময় ওঁর সঙ্গে যে বন্ধুতার সূত্রপাত হয় তা তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও অটুট ছিল।

তিনি যে আমার কবিতার মূল্য নির্দ্দেশে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, কেন না এই সব কবিতায় আমার নিজস্ব কোন ছাপ্ বড় একটা ছিল না। তাই ছাপার হরফে কবিতাগুলি যখন দেখতে পেতাম তখন মনে হত যে, সেগুলো যেন পাঠকদের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌছুবে না, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মন থেকে লোপ পেয়ে যাবে। যে সব নবীন সাহিত্য-সেবী সত্যি-কার কিছু করতে চায় তাদের পক্ষে Dagny (এশেলদের পত্রিকা) ঠিক যোগ্য স্থান নয়, কেননা এ পত্রে লোকে সামাজিক-সমস্যার সমাধানই বেশীর ভাগ দেখতে চায়—কবিতা নয়। এবং তবু যদি আমার কবিতার সত্যিকারের কোন মূল্য থাকে ত অন্যত্র তার স্থান হওয়া উচিত!

অপরিণত শক্তিকে এতটা উৎসাহ দেওয়া, আমার কিন্তু তেমন পছন্দ হয় না। কিন্তু এই উৎসাহ আমার যথেষ্ট উপকার করেছে। এর থেকে সবল হবম সন্দেহ ও "কিন্তুর' সংশোধন আমার হয়ে গেছে। তাই মন আমার লেখক হবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠিল।

এর কিছুকাল পরেই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, আমার কবিতা জনাদর লাভ করতে পারে নি, তখনই তিনি আমায় গদ্য লিখবার জন্যে উৎসাহিত করলেন। তিনি কিন্তু তবু আমায় স্পষ্ট করেই বললেন যে, আমার সনেটগুলো নাকি সত্যসত্যই চমৎকার, তবে আমার অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি যথেষ্ট নাকি রয়েছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, সজীবও নয়। এক কথায় বলতে গেলে, সেগুলি পড়তে কষ্টই হয়। তিনি বললেন যে গদ্যের গতি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বলে সেই দিক দিয়েই আমার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর বিশ্বাস যে, গদ্যেতেই আমার শক্তির সত্যিকারের বিকাশ হবে। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমার কবিতার চাইতে আমার গদ্য আরো খারাপ এবং প্রমাণ স্বরূপ ১৮৮৭ সালের শরৎকালে আমার সর্ব্বপ্রথম গদ্য লেখাটি তাঁর কাছে পাঠালাম। লেখাটা ষ্টক্হল্‌ম থেকে এই সমালোচনা নিয়ে ফিরে এল যে, 'এর বিষয়-বস্তু—চমৎকার, কিন্তু লিখন-ভঙ্গী একেবারে জঘন্য!'

তবে আগামী বড়দিনের ছুটীতে তাঁর নির্দ্দেশ মত ষ্টক্হল্‌মে এসে গল্পটি লিখবার জন্যে তিনি আমায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। এবারে তিনি কিন্তু আমায় তাঁর বাড়ীতে থাকতে বললেন না, তবে গেল বছরের মতই এবারও আমায় আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা করে গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে যে কয়ঘণ্টা কাটালাম তাতে বুঝতে পারলাম যে, এ বছরে আগের বছরের চাইতে আন্তরিকতা কিছুমাত্র কম নয়। আমার মনে হল যে, এবারে তিনি যেন ভারী বিষণ্ণ ও চিন্তিত রয়েছেন। হয় ত শারীরিক অসুস্থতা বা নারী-আন্দোলনে যে প্রতিকূলতা পাচ্ছেন তার দরুণই এই বিষণ্ণতা। গল্পটা আমার তখনো এমন অসমাপ্ত যে, তাকে কতকগুলি অসংলগ্ন বাক্যসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। লেখা সম্বন্ধে তিনি যে সব পদ্ধতি নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন আজো তার একটি নিয়ম আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেনে চলি। তিনি বলতেন, 'যা শুনতে ভাল লাগে না এবং যা অনাবশ্যক, তা নির্ম্মমভাবে বাদ দিবে।'

যতদূর মনে পড়ে, এই বছরের শরৎকালেই Jenny Lind-এর মৃত্যুতে তাঁর উপর একটি সনেট লেখবার জন্যে তিনি আমায় অনুরোধ করেন। একটি সনেট লিখলাম, কিন্তু তা ওঁর মনঃপূত হল না; আর একটি লিখলাম, সেটিও অগ্রাহ্য হল। তৃতীয় এবং চতুর্থ বার লেখার পর সনেটটি শ্রীমতী এশেলদের পছন্দ হল। এবং খুশী হয়ে চারটি সনেটই এক সংখ্যায় Dagny-তে প্রকাশ করতে চাইলেন।

তারপর অনেক দিন গেল, তাঁর আর কোন খবরই পাই নি। বলা বাহুল্য তার যে কোন সুসঙ্গত কার ছিল না, এ কথা অবশ্য বলা চলে না। এই সময় আমি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ভার্মল্যাণ্ড বইখানা লিখতে

ব্যস্ত ছিলাম এবং লেখার পক্ষে যতগুলি বাধা আসতে পারে সেগুলিকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে সংকল্প করেছিলাম। বইখানা লিখে শেষ করবার মত কোন পছন্দসই লিখন-ভঙ্গী তখনো আমার আয়ত্তে আসে নি। লেখার সব কিছু মালমশলা এক জায়গায় জড় করে চরিত্রালেখ্য এঁকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি ছকে ফেললাম। ১৮৮৯ সালের বসন্তকালে Gosta Berling-এর একটা পরিচ্ছেদ লিখে শ্রীমতী এশেলদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এই পরিচ্ছেদে বড়দিনের বল্‌নাচ্‌-এর দৃশ্য আঁকা হয়েছিল এবং Gosta Berling ও Anna Sjaruhok-কে নেকড়েবাঘে তাড়া করেছে, তাই দিয়ে এ পরিচ্ছেদ শেষ করা হয়েছিল। প্রথমবারে এ পরিচ্ছেদটা খুব বড় হয়েছিল। পরিচ্ছেদটা শ্রীমতী এশেলদের কাছ থেকে ফেরত পেলাম, তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেকটা বাদ দিতে পরামর্শ দিলেন। নির্দ্দেশ মত অদল বদল করে পরিচ্ছেদটা ফের্ ষ্টকহল্‌মে পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু কোন রকম জবাবই পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিয়ে একটি মেয়ে-স্কুলের-বার্ষিক মিলনে আহূত হয়ে আমি ষ্টকহল্‌মে গেলাম, কিন্তু শ্রীমতী এশেলদের খোঁজ নেব কি না প্রথমটা ভেবে পেলাম না। তিনি হয় ত আমাকে নিয়ে হয়রাণ হয়ে পড়েছেন, কেন না ইতিপূর্ব্বে যতবার এসেছি তিনি আমায় কিছু বলেন নি। সম্মিলন-মণ্ডপে একদিন আমার নামে তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপির একটি মোড়ক এসে উপস্থিত হল এবং মোড়কটি খুলে দেখতে পেলাম, লেখাটি আমার নয়, আর কারুর লেখা, ভুলে আমায় পাঠান হয়েছে। কাজেই বাধ্য হয়েই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে হল এবং দেখা করতে গিয়ে জানতে পেলাম যে তিনি আর অতঃপর সেই প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে থাকেন না, Norrmalm একটা সামান্য বাড়ীতে উঠে গেছেন। তাঁর এই পরিবর্ত্তনে আমার ভারী দুঃখ হল। নতুন বাড়ীটা যেন তাঁকে কিছুতেই মানাচ্ছিল না। জিনিষ-পত্রের আর সে জাঁকজমক নেই। আল্‌বার্টিনা—যে ওঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতো তাকেও আর দেখতে পেলাম না। শুনতে পেলাম, তিনি আর এখন Dagny সম্পাদন করেন না, Frau Kerfstedt-কে দিয়ে বিশ্রাম করছেন।

শ্রীমতী এশেল্‌দে নিজে আমার লেখাটি ছাপাতে খুব উৎসুখ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু Dagny-র বর্ত্তমান সম্পাদিকা কিছুতেই সেটি ছাপতে চাইলেন না। লেখাটা নিছক আজগুবি বলেই নাকি তাঁর মনে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করবার জন্যে এশল্‌দে আমায় বললেন, কিন্তু ফলে কিছুই হল না। এর পর বছর দেড়েক তাঁর আর কোন খবরই পেলাম না। কিন্তু ১৮৯০ সালের শেষাশেষী আমি Idun নামে এক কাগজের গল্প-প্রতিযোগিতায় Gosta Berling-এর পাঁচ পরিচ্ছেদে একটি পুরস্কার পেলাম। খবরের কাগজে যেদিন এ খবরটি বার হল, তার পরের দিনই এশেল্‌দের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, কী যে আনন্দ হল বলতে পারি নে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এতদিন যে উচ্চ আশা পোষণ করে এসেছেন, আজ তা পূর্ণ হতে চলল!

১৮৯১ সালের নববর্ষের প্রথম দিন আমি Idun পত্রের সম্পাদিকার সঙ্গে আমার বই সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে ষ্টকহল্‌মে গেলাম। তাঁকে জানালাম যে, যা-লিখে আমি পুরস্কার পেয়েছি তা আমার একখানা বড় বইয়ের অংশমাত্র। বইখানা প্রায় সম্পূর্ণ লেখা শেষ হয়েছে। গোটা বইখানা তাঁর কাগজে ছাপতে রাজী আছেন কি না জানতে চাইলাম। প্রস্তাবটি তিনি পরম আগ্রহে গ্রহণ করলেন। মনের গোপন কোণে এই আশাটি আমার ছিল যে, এর দরুণ তিনি আমায় যে মোটা রকম টাকাটা দিবেন তা পেলে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে বইটা ভাল করে দেখে শুনে শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে টাকা পয়সা বেশীকিছু দিতে চান, তা কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল না।

এর দিন কয়েক বাদে আমি আমার Gosta Berling-এর পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে শ্রীমতী এশেল্‌দের কাছে গেলাম। দেখলাম, তাঁর চেহারার ভারী বদল হয়েছে। আমার সাফল্যে তিনি খুব খুশী

হলেন। এতদিন পর যে তিনি Fraulein Mathilda Silow-কে সত্যিকারের বন্ধুরূপে পেয়েছেন, এ দেখে আমার ভারী আনন্দ হল। তিনি এখন শ্রীমতী Mathilda Silow-র বাড়ীতেই থাকেন, শ্রীমতী Mathilda আমায় বললেন, শ্রীমতী এশেলদের আদর্শ, তাঁর ভাবকে কার্য্যে পরিণত করতে, তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে প্রয়োজন হয় ত তিনি তাঁর জীবন পর্য্যন্ত দিতে সংকল্প করেছেন। এঁদের দু'জনার কাছে সেদিনকার সন্ধ্যাটা ভারী চমৎকার কাটল। লেখাটা জোরে জোরে পড়ে ওঁদের দু'জনকে শোনালাম। শ্রীমতী এশেল্‌দে ঠিক আগেরই মত মনপ্রাণ দিয়ে সাগ্রহে আমার পড়া শুনছিলেন। মনে হল, তিনি খুব খুশী হয়েছেন। অনতিবিলম্বেই বুঝতে পারলাম যে, আমার লেখা তাঁকে আশাতীত তৃপ্তি দিয়েছে। Fraulein Silow কিন্তু তাঁর মতামত প্রকাশে বেশ একটু অনুদারতাই দেখালেন। তিনি যেন, মনে হল, লেখাটা শুনে বেশ একটা ধাক্কা খেলেন। সত্যিকারের অনুরাগের চেয়ে তাঁকে যেন একটু বেশ হতবুদ্ধিই হতে দেখা গেল।

প্রথম থেকেই শ্রীমতী এশেল্‌দে আমার লেখা সম্পর্কে যে অসাধারণ সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সে কথা যখনই মনে হয় তখনই এটা মনে করে আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, যিনি সারাটা যৌবন রোমান্টিক আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছেন, তিনি কিন্তু কত সহজেই আমার লেখা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, অথচ আমাদের যুগের, যাঁরা ছেলেবেলা থেকেই বাস্তব সাহিত্যের আওতায় মানুষ হয়েছেন, তাঁরা কিন্তু আমার লেখা তেমন বুঝতে পারেন না। তিনি হয় ত সারারাত ধরে আমার পড়া শুনতে রাজী ছিলেন কিন্তু শ্রীমতী সিলো গুরুগম্ভীর চালে শ্রীমতী এশেল্‌দেকে লক্ষ্মী-মেয়েটির মত যথাসময়ে ঘুমোতে বাধ্য করলেন। পরের দিনও সেখানে গিয়ে বইটা পড়া শেষ করি, এশেল্‌দে এরূপ ইচ্ছা জানালেন। পরদিন যখন গিয়ে যথাসময়ে তাঁদের ওখানে পৌঁছুলাম তখন তিনি একা ছিলেন। ফ্রাউলিন সিলোর খোঁজ করতে তিনি একবার মাথাটা নেড়ে ইঙ্গিতে বুঝালেন।

তিনি বল্লেন, 'আমিই তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি; লেখাটা শুনতে তার উৎসাহ নেই, তাই।'

দুজনে মুখোমুখী বসে স্মরণাতীত যুগের প্রেম ও ভূতপিশাচের কাহিনীর মধ্যে একেবারে ডুবে গেলাম। তিনি কেবল শুনে গেলেন, কোনরকম মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। তবে বুঝতে পারছিলাম যে, লেখা তাঁর বেশ ভাল লাগছে। তিনি আমার কাহিনী গুলি নিজের অনন্যসাধারণ কল্পনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এমন চমৎকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার মনে হল, তিনি যেন আমার চাইতেও লেখাটাকে ঢের বেশী উৎকৃষ্ট করে বুঝে নিচ্ছিলেন! পড়া শেষ হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে শেষ হবে?' জবাবে আমি জানালাম যে, ইস্কুলে পড়িয়ে লিখবার সময় মোটেই পাই নে, ছুটী-ছাটার মধ্যেই লিখি। এমনি ভাবে লিখতে গেলে বছর দুই লাগতে পারে।

তারপর বিদায় নিয়ে সেদিনকার মত আমি চলে এলাম। পরের দিনই আমার কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করছিলাম, কিন্তু খুব ভোরে তাঁর লোক এসে আমায় জানালে, যাবার আগে তিনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি যখন তাঁদের ওখানে গিয়ে পৌঁছুলাম, তিনি তখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি! শুয়ে শুয়ে কেবল আমার কথা, আমার গল্প গুলির কথা ভেবেছেন।

দেখা হতেই বল্লেন, 'লিখতে যখন শুরু করেছ, তখন শেষ করতেই হবে। একজন বদলি খুঁজে ঠিক কর এবং ছুটী নিয়ে লিখতে বসে যাও। টাকা যা লাগে, আমি দিব!'

এমনি করে আমার জীবনে তৃতীয় বার তিনি আমার চরমভাগ্য নির্দ্দেশ করে দিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ থেকে ছুটী নিলাম, বইটা লেখা আগষ্ট মাসের শেষা-শেষিই হয়ে গেল। তিনি সাগ্রহে আমার লেখার বিকাশ প্রতীক্ষা করছিলেন। চিঠিতে তিনি কখনো উপদেশ, কখনো বা সতর্ক সাবধান করে দিতেন। বইটা শেষ হতেই তিনি পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে আগাগোড়া শুনলেন। বড়দিনের সময় বইটা ছাপা হয়ে বাজারে বার হল। যতটা আদর

হবে আশা করেছিলাম, ততটা আদর কিন্তু হল না। তাঁর কিন্তু তাতে কোন দুঃখই হল না। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে বইটা জনাদর লাভ না করায় পাছে আমি নিরুৎসাহ হই, এই জন্যে তিনি আমায় সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে লাগলেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হয়ে গেছে, কদাচিৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ও মাতৃজনোচিত ব্যবহার বরাবর অক্ষুণ্ণ থেকে আমার কল্যাণ কামনা করে এসেছে। ১৮৯৫ সালে ফ্রেডারিক ব্রেমার সোসাইটির দশম বার্ষিক উৎসবে আহুত হয়ে আমি ষ্টক্‌হল্‌মে এসে দেখলাম, তিনি ভারি রোগা এবং দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। তাই উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য অবশ্য কোন দিনই বড় ভাল ছিল না, অনেক দিন থেকেই রোগযন্ত্রণা ভুগে আস্‌ছিলেন, কিন্তু তা বলে এত শীঘ্র যে পরলোক থেকে তাঁর ডাক এসেছিল তা কিন্তু তখন কল্পনাও করতে পারি নি। তাঁর অসুখ বেড়ে যাওয়ার খবর পেয়েই আমি ষ্টক্‌হল্‌মে এসে পৌছুলাম, কিন্তু আমার পৌছুবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

আমার জীবনের সব চাইতে দুঃসময়ে তিনি পরম বান্ধবীর মত তাঁর অভয় হস্ত আমায় দেখিয়েছিলেন। আমার সাহিত্য-জীবনের সূচনায় তাঁর পথ-নির্দ্দেশ আমায় সাফল্যের পথে এনে দিয়েছে। সে কালে সাহিত্য-সেবীদের মেলামেশার বা শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। তাঁরা নিজেরাই জীবন থেকে শিক্ষাদীক্ষা সবকিছু অর্জ্জন করতেন। সেই কারণেই তাঁর সহানুভূতি তাঁর পথ-নির্দ্দেশ এবং সর্ব্বোপরি তাঁর উৎসাহবাক্য আমার কাছে অমূল্য বলে গণ্য। বিনিময়ে আমার কিছুই তাঁকে দেবার ছিল না — এক মাত্র অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে আমার সে অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করছি এবং যখনই আমার সে পরম হিতৈষিনীর কথা মনে হয়, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অন্তর আমার ভরে ওঠে।

সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্‌

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্‌ আপনার দেশে এবং বিদেশে যে যশ অর্জ্জন করেছেন, তাতে তাঁর নামের সার্থকতা উপলব্ধি হয়ে গেছে; কারণ ল্যাগার্‌লফ্‌ মানে লরেল পাতা—বিজয়ীর জয়মাল্য।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিচিত্র সুর লোকে সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফের একটা নিজস্ব সুর আছে। সে সুর, আমাদের বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ভুলে যেতে বসেছে এবং চারিদিকে যে রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও রীতিনীতির অভিযান চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে সে সুরের স্থান হবে না। সে সুর সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমার ঘুমপাড়ানির সুর, সে সত্য ও মিথ্যায় জড়িয়ে মানব-মনের আদিম রহস্যের সুর। তার পেছনে কোনও বিজ্ঞান নেই, কোনও দর্শনশাস্ত্র নেই। সে সুরের প্রাণ সন্ধ্যার একটী তারায় কাঁপে—বড় মৃদু, বড় কোমল, বড় অস্বাভাবিক। বিশ্ব-সাহিত্যে সে সুর শেষ শুনিয়ে যায়—নরওয়ের অপূর্ব্ব মায়াবী-শিশু হান্‌স্‌ আন্‌ডার্‌শন্‌। আন্‌ডার্‌শন্‌কে যাঁরা

শিশু-সাহিত্য ব'লে ফেলে রাখেন—তাঁরা বিশ্ব-সাহিত্যের কত বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন—তা তাঁরা জানেন না।

সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই সুর-সভা-লোকে সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ীর প্রতীক্ সুইডেনের এই গিরি-কন্যা এক অপূর্ব্ব সহজ মেঠো সুরের সংযোগ করেছেন—যা আধুনিক অন্য কোনও সাহিত্যিকের মধ্যে নেই। গর্কীর তেজস্বিতা তাতে নেই বটে, রঁলার গভীরতাও নেই, ফ্রান্সের তীক্ষ্ণধার মণীষাও নেই, আছে কিন্তু এক কোমল, শান্ত, নারী-হৃদয়ের পবিত্র পেলবতা যা উচ্ছ্বাসে কোন কোন সময় অবৈজ্ঞানিক—বর্ণনায় কোন কোন সময় বস্তু-সম্বন্ধরহিত। সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ্‌ বৈজ্ঞানিক মানুষের কানে রূপকথা বলেছেন—রূপকথার ছন্দে—আমাদের প্রচলিত কোনও 'ism-ই' সেখানে স্থান পায় না। সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফের সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে রূপকথার ছন্দ ও ভাবের একটা সুন্দর সমন্বয়।

সেল্‌মা যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় স্কাণ্ডে-নেভিয়ার সাহিত্য বস্তুতন্ত্রের পরিপূর্ণ প্রভাবে। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগের মধ্যে প্রাচীন যুগের সুর নিয়ে প্রাচীন 'সাগার' মর্ম্মকথায় অন্তর পরিপূর্ণ করে সেল্‌মা জন্মগ্রহণ করেন।

সুইডেনের ভার্মল্যাণ্ড প্রদেশে Sunne নগরে মারবাকা ম্যানরেতে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ২০ নভেম্বর সেল্‌মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই-বোনেরা অনেকগুলি ছিল, তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তাঁর পুরানাম Selma Ottalina Louisa Lagerlof.

সেল্‌মার বাবা ছিলেন একজন সৈন্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারী; বৃদ্ধ বয়সে জমি-জমা কিনে শান্তভাবে আপনার ছোটখাট জমিদারীতে জীবন যাপন করছিলেন। ছেলেবেলায় সেল্‌মাকে অন্য সমস্ত ছেলে-মেয়েদের মত ছুটোছুটী করতে দেখা যেত না, আপনার খেল্‌না নিয়ে শিশু-সেল্‌মা গম্ভীর ভাবে চুপ করে বসে ছেলে-মেয়েদের খেলার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। শিশুকাল থেকেই মেয়েটীর লেখাপড়ার দিকে ভয়ানক ঝোঁক এবং যে বয়সে ছেলেমেয়েরা খেল্‌না নিয়েই ব্যস্ত থাকে সেই বয়স থেকেই সেল্‌মা বই নিয়ে পড়তো—আপন মনে একটা নিরালা ঘরের একটী কোণে বসে। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতে অতিথি এলে গল্প শোনবার জন্য তাকে ব্যস্ত করে তুলতো।

সুইডেনের গ্রামে গ্রামে, তার বাতাসে বাতাসে এখনও তার প্রাচীন দিনের সব বীরপুরুষের অপরূপ কাহিনী ঘুরে বেড়ায়, এখনও গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে মুখে কত প্রাচীন রূপকথা, বিচিত্র কাহিনী সদ্য ঘটা ব্যাপারের মত নড়ে চড়ে বেড়ায়। বালিকা সেল্‌মা তন্ময় হয়ে সেই সব কাহিনী শুনতো আর তার শিশুর মন কল্পনার পুষ্পরথে চড়ে উধাও হত—জাতির রূপকথার স্বপ্নলোকে।

সেল্‌মার বাবার একটী লাইব্রেরী ছিল; বৃদ্ধ কন্যাকে অবাধে সেই সমস্ত বই ঘাঁটবার অধিকার দিয়েছিলেন। মেয়েটী কোন বই খুলে কিছু বুঝতো, কোনটী খুলে হয় ত কিছুই বুঝতো না, কিন্তু সেই লাইব্রেরীই ছিল তার খেলাঘর। সেল্‌মার বাবা-মা দুজনাই ছিলেন খুব উদার এবং উচ্চ শিক্ষিত, তাই মেয়েটীর শিক্ষার দিক দিয়ে যাতে কোনও ত্রুটি না হয়—তাতে তাঁদের বিশেষ নজর ছিল।

নয় বছর বয়সের সময় Sunne থেকে সেল্‌মা সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্ শহরে শীত কাটাবার জন্য আসেন। সেখানে তাঁর কাকা থাকতেন।

এই Sunne থেকে Stockholm আসার স্মৃতি সেল্‌মা পরে এক গল্পে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রামের মুক্ত-জীবন থেকে একেবারে রাজধানীর পাষাণ কারায়—বালিকা কিছুতেই আপনার মনকে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিল না। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

'শহরের ছেলেমেয়েদের কেমন আলাদা আলাদা লাগতো—তারা কেমন চালাক, তাদের হাবভাব কেমন সোজা অথচ সহজ। আমি এদের দলে পড়ে একেবারে বোকা হয়ে গেলাম। তারা বলে পরিশুদ্ধ নগরের

ভাষা—আমার কথা সেই ভার্মল্যাণ্ড-এর ; কিন্তু সে যাই হোক্, এখানে কতকগুলি জিনিষ আশ্চর্য্যরকম সুন্দর পাওয়া গেল—এক র‍্যাক দেখি স্যর ওয়াল্‌টার স্কটের নভেল,—আর একটা জিনিষ থিয়েটার।"

মাঝে মাঝে এক বুড়ী সেল্‌মাকে থিয়েটারে নিয়ে যেত। থিয়েটারের রঙ, আলো, পোষাক সমস্তই বালিকার মনে এক পরীর রাজ্য বলে মনে লাগত।

শীত শেষ হয়ে গেলে ষ্টক্‌হলম্ থেকে Sunne-তে ফিরে গিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেল্‌মা নিজে এক থিয়েটারের দল গড়ে তুললো। বাড়ীর সকলে সামনের মহা ধুমধামে সেই অভিনয় সমাধা হল। সেল্‌মা নিজে লিখছেন, "সেইদিন থেকে ইস্কুলে বসে অনর্থক আর অঙ্ক না ক'সে নাটক লিখতে সুরু করে দিলাম। পনের বছর বয়সে আমাদের বাড়ীতে যত কবিতার বই ছিল সমস্ত পড়া শেষ করে ফেলি এবং তখন থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করি।"

বিশ বছর বয়সে সেল্‌মা আবার ষ্টক্‌হল্‌ম্-এ আসেন। এবার বেড়াবার জন্য নয়—Teacher's College-এ প্রবেশাধিকার অর্জ্জনের জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে। পচিশজনকে নেওয়া হবে—মোট পরীক্ষার্থী ছাত্রীর সংখ্যা চল্লিশ। এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে সেল্‌মা উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ সালে Teacher's College-এ প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিন বছর তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়। এখানকার পড়া শেষ হলে সেল্‌মা Skane প্রদেশে এক বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজের অবসরে অবসরে মন সাহিত্যের রূপমহলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত; কিন্তু এ সময় তিনি বিশেষ কিছুই লিখেন নি। মাঝে মাঝে কাগজে কবিতা পাঠাতেন এবং ক্লাশের ছুটির পর মেয়েদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপূর্ব্ব রহস্যময় সব গল্প বলে যেতেন।

তারপর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—The Story of Gosta Berling তাঁর মনে জমা হয়ে উঠতে থাকে।

প্রথম যৌবনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ও সাধনার বিবরণ সেল্‌মা লেগার্‌লফ্ স্বয়ই দিয়েছেন। Gosta Berling-এর কাহিনীর জন্মকথা নিয়ে তিনি "The Girl from the Marsh Croft" নামক গল্পের বইতে The story of a story" নাম দিয়ে একটা গল্প রচনা করেছেন। সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফের জীবনের সঙ্গে এই গল্পটীর বিশেষ যোগ আছে—কেন না এই গল্পটাই হচ্ছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। সেল্‌মার আপনার কাহিনী থেকে সারাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

"একটা গল্প হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো', তাকে রূপ দিয়ে পৃথিবীর মাঝে প্রকাশ করে কেউ পাঠায় নি। অনেক লোক, নানা ঘটনা দিয়ে, নানা রহস্যময় কাহিনী দিয়ে, এই গল্পটাকে গড়ে তুলেছিল। এর শুধু অভাব ছিল—একজন মালাকরের ; যে, তার ছিন্নসূত্রগুলো গেঁথে জগতের সামনে ধরতে পারে। সেই সমস্ত বিচিত্র কাহিনী-গুলো গ্রীষ্মকালের মধু-লোভী ভ্রমরগুলোর মত মৌচাকের খোঁজে যেন গুন্‌গুন্ করে বেড়াত—কোথায় এতদিনের এত মধু চাক বাঁধে, কে জানে!

"জন্মভূমি ভার্মল্যাণ্ডের পাহাড়ের কোলে এই সব কাহিনীর জন্ম হয়। কতদিন, কত রাত, তারা পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে ঘাটমাঠ পেরিয়ে কত লোকের ঘরের দরজায়, কত খোলা জানালায় গিয়ে তাদের আবেদন হয় ত জানিয়েছে; কেউ তাদের মালা করে গাঁথে নি। ব্যর্থ হয়ে দলে দলে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ফিরে গেছে সব। ব্যর্থ হবে না তো কি? লোকের জীবনে কত প্রয়োজনীয় কাজ—কে গাঁথে মালা!

"অবশেষে একদিন তারা নানা পথ ঘুরে এল—মারবাকার একটা ছোট্ট বাড়ীতে—চারদিকে তার বিরাট গাছের সারি। এখানকার লোকেরা বই-টই নিয়ে খুব বেশী ঘাঁটাঘাটি করতো, পড়া শুনাও তারা করতো অন্য লোকদের চেয়ে বেশী। এখানকার বাতাসে কোনও তাড়ার ইঙ্গিত ছিল না—সব খানি জুড়ে একটা শান্ত বিশ্রামের ভাব নিত্য বিরাজ করতো। কাজের ভিড়ের কোনও শব্দ এখানে শোনা

যেত না—চেঁচামেচি, রাগ, ঝগড়াঝাঁটি দরজা থেকেই ফিরে যেত। এখানে যাঁরা অতিথি আসতেন, তাঁদের ওপরও কোনও আদব-কায়দার চাপ পড়তো না—তাঁর প্রথম কাজ হ'তো মনকে বোঝান—সহজ মনে জীবনকে নাও—আর জেনো আজ এই ঘরে যারা রইলো বা যারা এলো সবারই সমান কল্যাণের দিকে তিনি সজাগ হয়ে আছেন।

"জানি না এইসব কাহিনীগুলো কতকাল ধরে এইখানের হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কেউ তাদের ডাকে নি। শীতের কুয়াসা যেমন পাহাড়ের চূড়া ঘিরে থাকে মারবাকাকে এরা তেমনি করে ঘিরে ছিল—মাঝে মাঝে হয় ত ক্ষণিক বৃষ্টিধারার মত কেউ কেউ মাটীতেও নেমে এসেছিল।

* *

"মাঝে মাঝে কাহিনীগুলো রক্তমাংশের রূপ নিয়ে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হত। বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, অন্নহীন, লোলচর্ম্ম, অস্থিসার পুরাণো দিনের কোনও সৈনিক অফিসার তারই মতো জীর্ণ অস্থিসার ঘোড়ায় চড়ে সপ্তাহ খানেকের জন্য অতিথি হত। সন্ধ্যাবেলায়, ভাটী-খানা থেকে ফিরে এসে, তাদের চাংড়ায় একটু টান্ ধরতো, স্বর আর একটু দৃঢ় হত—তারা অনর্গল বলে যেত—একদিন—সে যে কত দিন আগে, তার কি ইয়ত্তা আছে—তারা কেমন মোজা না পরেই নাচতে নাচতে পা তাদের ক্ষয়ে যেত—কেমন ভাবে কিসের জন্যে তাঁরা কোঁকড়ান চুল পরতো—গোঁফে রঙ লাগাত—এই সব। আর একবার আর একজন এসে গল্প করলো—কেমন করে ঝড়ের রাতে সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে সে তার প্রিয়তমের কাছে পৌছে দিয়েছিল—পথে পালে পালে নেকড়ে বাঘের সঙ্গে সে কি ভীষণ লড়াই! আর একজন এসে গল্প করতো—একটা বুড়ো সামান্য দোকানদারের কথা—দু এক পয়সা যা বিক্রী করতো—কিন্তু সে বিটোফেন বাজাত।

* * *

"যে বাড়ীর চারিদিকে এই সব কাহিনী তাদের ব্যর্থ জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াত, সেখানে ছিল একটী ছোট্ট মেয়ে। তার শৈশবের কানে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির মতো এই সব কাহিনী কত কথা বলেছে। তাই তো তার সাধ গিয়েছিল এই সব কাহিনীর ছিন্নসূত্রগুলো মালা করে গাঁথতে। বাড়ীর ছেলেদের কানে কাহিনী-গুলোর কোনও আবেদন পৌছত না, কারণ তারা থাকৃত তাদের স্কুলে, তাদের পড়া-শোনার বই নিয়ে। যে মেয়েটীর হৃদয়ে এদের আবেদন এসে পৌছাল সে ছিল বেতসের মত ক্ষণভঙ্গুর; বাইরে খেলার মাতনে সে যোগ দিতে পারে নি কোন দিন। তার আনন্দ ছিল থাকে থাকে ভরা, তার বাবার লাইব্রেরীতে। মন তার শুধু শুনতে চাইতো বিচিত্র সব কাহিনী—পৃথিবীর পুরণো দিনের সব আজগুবি কথা।

"সে যাই হোক, মেয়েটীর মনে এই গল্পগুলো গেঁথে বই লেখবার কোনও বাসনা প্রথমে ছিল না। সে জানতোই না যে, এই সব কাহিনী নিয়ে বই লেখা যায় কি না।

"তবে সে লিখতো। খানিকটা নিজের মাথা থেকে আর সবটা যে সব বই সে পড়তো তার ভেতর থেকে। ঘরে বসে মেয়ে আপনার মনে কাগজ পেলেই লিখে যেত—কত গল্প, কত কবিতা, কত কি! যখন সে লিখতো না—সে চুপটি করে বসে থাকতো, বড় হবার আশায়!

"তার ধারণা ছিল, হয় ত একদিন তাদেরই বাড়ীতে অতিথি হয়ে একজন খুব বিদ্বান আর প্রতিপত্তিশালী লোক এসে পড়বে—কোনও অদ্ভুত উপায়ে হয় ত লেখাগুলো তিনি দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেগুলি ছাপাতে নিয়ে যাবেন। তারপর জগতের ঘরে ঘরে তো তারই কথা কানাকানি হবে। কিন্তু এ রকম কিছুই ঘটে উঠ্‌লো না।

" তারপর তার যখন বয়স হলো এক কুড়ি দুই, সে এলো ষ্টক্‌হলম্ শহরে, শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য পরীক্ষা দিতে।

দেখতে দেখতে আপনার কাজের মধ্যে সে আপনাকে হারিয়ে ফেল্লে। স্কুল, তার পড়াশোনা, লেক্‌চার—এরই

মধ্যে সে আত্মনিয়োগ করলে। মনে হল—বুঝি সেই পুরাণো কাহিনীর দল অবশেষে ব্যর্থ হয়ে তারও কাছ থেকে ফিরে গেছে।

"কিছুদিন এমনি যায়। হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার ঘটলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে লেক্‌চার শুনে মেয়েটী বাড়ী ফিরে আসছিলো। হাতে তার বই-এর গোছা। বেলম্যান ও রুনেবাগ সম্বন্ধেই মেয়েটি মনে মনে ভাবছিল। ভাবছিল তাঁদের সৃষ্ট যত সব বিচিত্র সৈন্য আর অদ্ভুতকর্ম্মা, জগতে একান্ত বেপরোয়া সব চরিত্রদের কথা। এই চিন্তার রাজপথ বেয়ে সহসা মেয়েটীর মন গিয়ে পড়লো তার জন্মভূমির পথে—যেথানে তখনও ভ্রমরের মত দল-হারা কাহিনীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। মনে পড়ে গেল তার সেই সব কাহিনীর বিচিত্র লোকদের কথা! তাদের নিয়ে ত সে-ই রূপ দিতে পারে—সে-ই তো পারে মালা গাঁথতে।

'মনে মনে তখনই গল্পের অঙ্কুরটী যেন মাথা তুলে উঠলো। মেয়েটীর মনে হ'ল সহসা পায়ের তলার সমস্ত পথ দুলে দুলে উঠছে। চোখের সামনে বিস্তীর্ণ দীর্ঘ রাজপথখানি যেন একবার প্রান্তদেশ দিয়ে আকাশ স্পর্শ করছে, আবার নেমে আসছে। মেয়েটী নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। – পথের মাথা-ঘোরা থামলে তবে সে আবার চলবে! কিন্তু চারিদিকে চেয়ে মেয়েটী একান্ত বিস্মিত হয়ে দেখলো যে, পথে আরো অনেকে চলেছে—নিতান্ত সহজ ভাবে। পথের এই অদ্ভুত খেয়ালের কথা তারা কেউ জানে না।'

* * *

"সেই দিন মেয়েটীর মনে যে বাসনা বাসা বেঁধে রইল যে, ভার্ম্‌ল্যাণ্ডের কাহিনীর বিচিত্র লোকদের নিয়ে একটা পরিপূর্ণ কাহিনী গড়ে তুলতে হবে—তা আর মেয়েটীর মনকে ছাড়ল না। মৌমাছিরা বুঝি চাক বাঁধবার যায়গা খুঁজে পেল!

"পাঁচ বছর লাগলো সেই মৌচাকটীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধু ভরে উঠতে! একেবারে বনের বুকের বুনো ফুলের বুক থেকে চুরি-করা মধু! বনফুলের গন্ধে ভরা! গোষ্টা বার্লিঙের কাহিনীর মধ্যে সমগ্র সুইডেনের রূপকথার প্রতিমূর্ত্তি ফুটে উঠলো। অসম্ভব, সম্ভব, কথা আর কাহিনী নিয়ে সন্ধ্যা-তারার আলোয় গাঁথা যুঁই ফুলের এক-নরী হার! বড় পবিত্র, বড় কোমল, বড় রহস্যময়।

গোষ্টা বার্লিঙের কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের সংখ্যা কম নয় এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনের ধারা গল্পের মূল ধারাকে বেশ আবর্ত্তশীল করে তুলেছে। নানা রকমের মেয়ের প্রেমের ধারা নায়কের উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার সঙ্গে মিশে গল্পটিকে ঘোরালো করে তুলেছে কিন্তু আসলে গল্পটীর মূল অল্প কথায় শেষ হয়ে যায়। স্বাধিকারপ্রমত্ত ধর্ম্ম-যাজক গোষ্টা-বার্লিঙ আপনার ধর্ম্মাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে মৃত্যু-ময় তুষারের মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করবার জন্যে যখন মৃত্যুর শ্বেতরূপের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন তখন Ekeby প্রদেশের অধিকারিনী সেই তুষার-স্তূপ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। গোষ্টার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা হল—তখন নারীটীর হাতে কয়লা-তোলার ময়লা দাগ, মাটীর পাইপ মুখে, পায়ের জুতো আলকাতরায় ভরা, বুকেতে একটা খোলা ছুরী গোঁজা! প্রথম আলাপে সে আঙুল নেড়ে আপনার পরিচয় দিয়ে বল্‌লে, আমি যদি এই একটা আঙুল নাড়ি, তাহলে দেশের যিনি শাসন-কর্ত্তা তাকে এখনি এখানে ছুটে আসতে হবে—দুটো নাড়লে দেশের প্রধান পুরোহিত পর্য্যন্ত ছুটে আসবে—আর যদি এই তিনটে আঙুল নাড়ি তাহলে সমস্ত ভার্ম্‌ল্যাণ্ড নাচতে নাচতে এগিয়ে আসবে আমার দিকে। এই রহস্য-ময়ী নারীর কাছে গোষ্টা আত্মসমর্পন করলো। Ekeby-র বিরাট মহলে এই নারীর অর্থে নানা রকমের অকর্ম্মণ্য লোক সব রাত-দিন পড়ে রয়েছে—বিচিত্র আলস্যময় জীবন তাদের। এই দলের মধ্যে এসে জুটলেন মৃত্যুর দক্ষিণ দ্বার থেকে ফিরে গোষ্টা বার্লিঙ। গোষ্টা বার্লিঙের চরিত্র আর জীবনের ধারা Ekeby-র সেই বিচিত্র জীবনযাত্রার সুরে গাঁথা। একাধারে সে কবি, প্রচারক, মাতাল। সেল্‌মা আপনার নায়কটীর চরিত্রের দুই কথায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন গোষ্টা বার্লিঙের চরিত্রের সে-ই সব চেয়ে বড় পরিচায়ক। সে একাধারে "Strongest and weakest

of men." সাহিত্য-জগতে গোষ্টা বার্লিঙের সহোদর বোধ হয় নেই—আপনার চরিত্রের বিচিত্র ভঙ্গিমায় সে অপূর্ব্ব। গোষ্টার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যে, তার আশে-পাশের নারীদের সে যেন আকর্ষণ করে আনে—সে গর্ব্ব করে বলে যে, তার ওষ্ঠ দশ হাজার বার নারীর অধর স্পর্শ করেছে আর তার বাক্সে অন্তত তেরো হাজার প্রেম-পত্র আছে। সত্যই আছে। অন্যায় আর পাপ তাঁকে যেমন উন্মাদনায় টানে তেমনি ধারায় তাকে টানে মানবের মঙ্গল প্রবৃত্তিগুলি। জীবনের পিছনে তার বৃহৎ কোন দার্শনিক বসে নেই—খেয়ালী সে—খাম-খেয়ালের তারার ইসারায় তার জীবনের নদী খালি মোড় বেঁকে বেঁকে চলে। সাহিত্যের জগতে উত্তর-য়ুরোপের এই উদাসীন ক্রিড়াশীল উদ্দাম নায়কটীর শিশু-অন্তঃকরণ এক আনন্দ-রসঘন মূর্ত্তিতে বিরাজ করছে। একদিন এক Christmas সন্ধ্যায় Ekeby-র সেই মহলায় আগুনের চুলীর ধারে বসে যখন এই সমস্ত বৃত্তি-ভোগীর দল উৎসবরসে মত্ত, তখন আগুনের নিভে-আসা ফুলকিগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বিচিত্র ধরণের এক দৈত্য! আগুনকে ঘিরে সে উন্মাদ নৃত্য সুরু করে দিলো। সকলের কাছে সে নিবেদন জানিয়ে বললো যে, তাদের প্রতিপালক সেই নারী আত্মকৃত পাপের জন্যে তার কাছে পণবদ্ধ। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তের দিন সমুপস্থিত জেনেও সে প্রতিবিধান করছে না—অতএব তাদেরই কর্ত্তব্য যে পাপের শাস্তি বিধান করবার জন্যে এখান থেকে নিঃস্ব করে তাকে পথে বার করে দেওয়া। একদিন অবশেষে তাই হলো। Ekeby-র অধিকারিণী, তারই অন্নে পুষ্ট লোকদের দ্বারাই পথে বিতাড়িত হল। গোষ্টা বার্লিঙও একটী কথা বল্লে না।

Ekeby-র মহলায় তখন উৎসবের জোয়ার এসে পড়লো—; জীবনকে আকণ্ঠ পান করে নেবার এই সুবিধায় বহুদিনের অনশনক্লিষ্ট পেটুকের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই সময়কার তাদের জীবনের ঘটনা শাখাপল্লবে ভরে উঠলো। গোষ্টা বার্লিঙের চারিদিকে বিচিত্র সব নারী-জীবনের কুন্দ শেফালিকা ফুটে উঠলো। লোকে যখন তাকে Ekeby-র জীবনযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করে, সে বলে, "Milk and honey flow there" সেখানে এখন বাতাসে মধু পরশে মধু। "পাহাড়কে চুঁইয়ে আমরা সুরার পাত্র ভরেছি—মাঠ থেকে আনা সোনা - তাই দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছি জীবনের কালো কালো দাগগুলো-বন কেটে বাস তৈরী করেছি—নিশীথরাত্রের উৎসব-বাদ!"

কিন্তু Ekeby-র মহলার ভেতরে যখন এমনি অবাধে চলেছে উৎসবরস—ওধারে দেখতে দেখতে বিরাট সম্পত্তি শেষ হয়ে এলো। মাঠ থেকে সোনা আর আসে না—মাটির রস শুকিয়ে আসে। পাহাড় থেকে সুরা আর আসে না—পাহাড় শুধু পাথর হয়ে যায়। আর Ekeby-র পথে প্রান্তরে একটী জীর্ণা স্থবিরা নারী ভগ্ন-দেহ যষ্টির উপর ভর দিয়ে ভিক্ষার থলি কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—আকাশের দিকে চায়—কবে হবে তার ঘরে ফিরে যাবার সময়!

এই সময় এই ভাঙনের মুখে Countess Elizalbeth-এর প্রেমের মধ্যে Gosta Berling জীবনের স্থির মূর্ত্তি দেখতে পেলে। এলিজাবেথ এসে গোষ্টাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল—দূরে, তাদের দুজনের পৃথিবীতে। একদিন এক নারী তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে—জীবনের বাহির-লোকে—জীবনের শেষ-প্রান্তে আর এক নারী তাকে নিয়ে গেল জীবনের কোলাহল থেকে দূরে—জীবনের অন্তর-লোকে—রসের অমর-ধামে! এক নারী যেন কামবিধুরা তন্বমধ্যা অকালবসন্তবিলাসিনী উমা—আর এক নারী যেন তপঃকৃশা বৈরাগিনী শিবসমর্পিতা পার্ব্বতী! উমা কি পার্ব্বতী নন্?

[১৯০৭ সালে সেল্‌মা ল্যাগার্‌লফ University of Upsala হইতে Doctor of Literature উপাধি পান। তাহার দুই বছর পরে তিনি সাহিত্যের জন্য Nobel Prize পান। ১৯১৪ সালে তিনি Nobel Prize নির্ব্বাচন-সভায় জগৎ বিখ্যাত আঠারো জন সভ্যের মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হন।

পাঠকবর্গের নিকট একটি নিবেদন করিতেছি। কল্লোলে প্রথম যখন 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌' নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাসখানির অনুবাদ প্রকাশিত হয় তখন হইতেই ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয় আমাদের প্রিয়বন্ধু গোকুলচন্দ্র নাগকে অনুবাদ কার্য্যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয়, সেবারে আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই গোকুলচন্দ্র নাগ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তবুও অসুখের সমস্ত যাতনার মধ্যেও তিনি একক্রমে 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌' অনেকখানি অনুবাদ করিয়া যান। কয়েক মাস পরেই গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অনুবাদ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, এবং শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। এই ভাবেই এতকাল জাঁ ক্রিস্‌তফের অনুবাদ চলিয়া আসিতেছে।

বন্ধুবর্গের মুখে ও পত্রাদিতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, আমাদের পাঠকদের মধ্যে অনেকেই এই অনুবাদটি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। আমাদের উদ্দেশ্য যাহা ছিল, তাহা এই ভাবে পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ভাল ভাল বিদেশী ভাষায় লিখিত উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলে অনেক পাঠক পাঠিকার পক্ষে বিদেশী প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির উপকরণ ও রচনাপদ্ধতি জানিবার সুবিধা হয় ভাবিয়া আমরা প্রথমে জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ অনুবাদ করিতে প্রয়াসী হই। সুখের কথা অনেকেই ইহা সাদরে গ্রহণ করেন। এই উপন্যাসখানি মূল ফরাসী ভাষায় প্রায় ৬ খণ্ডে সমাপ্ত এবং উহারই ইংরাজী অনুবাদ চারিখণ্ডে সমাপ্ত। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা দুইখণ্ড সমাপ্ত করিয়া দিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, অন্য খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ অনুবাদ করিতে আরও বহুবৎসর লাগিবে। এতদিন ধরিয়া একই উপন্যাস চলিতে থাকিলে হয় ত পাঠকবর্গের তাহার প্রতি সেরূপ অনুরাগ বা আগ্রহ না থাকিতে পারে। বিশেষ করিয়া প্রত্যেক বৎসরে নূতন গ্রাহকদের পক্ষে মাঝখান হইতে এই উপন্যাস পাঠ করা সুবিধা হয় না।

অথচ শুধু এই উপন্যাসখানি আদ্যন্ত পড়িবার জন্য নূতন গ্রাহকদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সমস্ত কল্লোল ক্রয় করাও সব সময় সুবিধা হয় না, তদুপরি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সম্পূর্ণ সেট্‌ আমাদের কাছে নাই।

নানা দিক ভাবিয়া আমরা এ বৎসরে নূতন করিয়া জাঁ ক্রিস্‌তফের অন্য আর এক খণ্ড অনুবাদ আরম্ভ করা স্থগিত

রাখিলাম। এ বৎসরে আরম্ভ করিলে আগামী বৎসরেও তাহা চালাইতে হয়। আমরা ভাবিয়াছি তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক বৎসরের জন্য এক একখানি বিদেশী উপন্যাস সম্পূর্ণ ভাবে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিব। ইহা ভাবিয়াই সুপ্রসিদ্ধ Pan উপন্যাসখানা 'মীনকেতন' নাম দিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি। আশা করা যায় এখানি এ বৎসরেই শেষ হইয়া যাইবে। এবং আগামী বৎসরে অপর একখানি উপন্যাস বাছিয়া অনুবাদ করা হইবে।

এরূপ ভাবে জঁা ক্রিস্‌তফ্‌ অনুবাদ বন্ধ করাতে আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকা কেহ যদি অসন্তুষ্ট হন তাহার জন্য আমরা সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কল্লোলের পাঠকবর্গ হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমরা ক্রমশ কল্লোলের উন্নতির চেষ্টা করিতেছি।

অবশ্য আমাদের সাধ্যাতীত যাহা তাহা পারি না। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের লেখা আমাদের পক্ষে পাওয়া দুর্ঘট। তাঁহারা এত ব্যস্ত ও অন্যান্য কাগজে লিখিতেই তাঁহাদের এত সময় দিতে হয় যে, ইহার উপরে আমরা স্নেহের দাবীতে তাঁহাদের কাছে লেখা চাহিয়া তাঁহাদের বিব্রত করিতে সঙ্কোচ বোধ করি তাহাদের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ থাকিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। তবুও রবীন্দ্রনাথের লেখা মাঝে মাঝে পাইয়াছি। আমাদের প্রতি তাঁহার এই স্নেহের দানের জন্য আমরা সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিব। শরৎচন্দ্র নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও আমাদের লেখা দিতে পারেন নাই। তবে কল্লোলে যখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ধারাবাহিক ভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন শরৎচন্দ্র উহা প্রকাশের

অনুমতি দিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন কল্লোলে বাঙলার প্রায় প্রত্যেক প্রথিতযশা লেখক বা লেখিকাই তাঁহাদের রচনা দিয়া আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় গত ২৮শে নভেম্বর ইউরোপ হইতে স্বদেশে ফিরিয়াছেন।

তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বহুলোক রেলওয়ে ষ্টেশনে পুষ্পমাল্য প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে আসিলে সকলে জয়ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। দিলীপকুমারকে নিজ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য এই বাঙলাদেশেই বহুবার বিদ্রূপ ও বিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এবার দেখিয়া আনন্দ হইল, সেই দিলীপকুমারকেই—বাঙলার জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়—তাঁহাদের গৌরব স্বরূপ এই তরুণ চারণকে অন্তরের প্রীতি দ্বারা তাঁহার সফলতাকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

আমাদের দেশে যাহারা সাহিত্য চর্চ্চা করে তাহাদের সকলেই বিদ্রূপ করে। তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্য-সেবকগণ অধিকাংশই দরিদ্র। সাহিত্যের সেবা করিয়া এ দেশে খুব কম লোকই অর্থশালী হন্। সাহিত্যের পথে আসিলে না খাইয়া মরিতে হয় তাহা অন্য লোকেও জানে, যাহারা সাহিত্যের সাধনা করে তাহারাও জানে। তবু যুগ যুগ ধরিয়া মানবকুল কেন যে সাহিত্যের এই নিত্য দুর্ভিক্ষের পথে আসিয়া পড়ে তাহা অনেক সাহিত্যিক নিজেরাও বলিতে পারে না। তবু তাহারা সাহিত্যকে পূজা করে, তাহার সেবায় সাংসারিক হিসাবে অনেক সৌভাগ্যকে ত্যাগ করে। তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া তাহারা মনে যে আনন্দ পায় তাহা তাহাদের নিত্যকার হিসাব-নিকাশের খতিয়ান্ খুঁজিয়া পায় না।

মানুষের দিনের পর দিন চলিয়া যায়, জীবনটা বেশ সমান ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মাঝখানে মানুষের মনে যে জ্যোতির্ম্ময় অবকাশের অভ্যুদয় হয় তাহাই মানুষকে ভবিষ্যতের হিসাব আর করিতে দেয় না। বর্ত্তমানের আনন্দের কাছে মানুষ আপনাকে বিকাইয়া দেয়। মানুষের বুদ্ধিমানের জীবন, সাবধানের জীবন দেনা-পাওনার রৌদ্র প্লাবনের মধ্যে ভাসিয়া যায়। আনন্দের মধ্যে দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম, প্রত্যহের অতীত এই ক্ষ্যাপার জীবনকে হিসাবী মানুষ সহ্য করিতে পারে না। দারিদ্র্যের এই উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ ত্রাসে কম্পিত হয়। কিন্তু ক্ষ্যাপা দেখে ইহারই মধ্যে আনন্দের আপন সৃজিত নিয়মের শৃঙ্খলা, অমৃতের শুভ্র শান্তমূর্ত্তি। এই ক্ষ্যাপার দল নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আপনাকে দশের সঙ্গে মিলাইয়া একাদশ জন হইয়াছে দেখিতে চায়। এই তার আশা। তাই সুখের সুধাটুকুকে নির্ব্বোধ ছেলের মত ফেলিয়া রাখিয়া দুঃখের বিষকে অকাতরে পান করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের পাত্রে পড়িয়া সে বিষ অমৃত হইয়া উঠে। দ্বিধাহীন, বন্ধহীন সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে তাহার মন নাচিতে চায়। ভয়ের আক্ষেপে তার আর তাল কাটিয়া যায় না, অভাবের রুদ্র গর্জ্জন আর তাহাকে ফিরাইতে পারে না। সে জানিয়া বসে, এই সাধনার মধ্য দিয়া সে অপরিচিতকে পাইবে। যাহাকে চোখে দেখে না তাহার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইতে পারিবে! প্রতিদিনের ঘরকন্নার বাহিরে সে এক অপূর্ব্ব জীবন, সপ্তলোকের সঙ্গে তার মিলন!

সাহিত্যের এই যোগ-সাধন তাই চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। ইহা ধনকে ডিঙাইয়া মানুষের মনকে পাইয়া বসে। সেই দিন হইতে মানুষের জীবনের দরজা হইতে

দৌবারিক বরখাস্ত—রাজপথের মত দ্বার-পথ দিয়া মানুষের সুখ দুঃখ নির্ভয়ে আসা যাওয়া করে। রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, মানব-সংহিতা তাহার সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া যত অকাজ করিয়া যায়, তাহাই তাহার কাজের ধারা, তাহাই তাহার পরম সাধন ও সিদ্ধি।

দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করা খুব সুখের নয়; এবং অন্য পথ থাকিতে দারিদ্র্য লইয়া ঘর করাকে লোকে প্রশংসা করেন না, তবুও সাহিত্যিকের পক্ষে অন্য উপায় নাই বলিয়া সাহিত্য লইয়া দারিদ্র্য ভোগ করিতেই হয়।

যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব হৃদয়কে বারংবার উদ্বোধিত করে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাকে সঙ্কীর্ণ করে না, সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে যাহা চিরন্তনের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলে, সে সাহিত্য ও তাহার চর্চ্চা দৈন্যস্বরূপে আঘাত করিলেও নিখিলের মঙ্গলোৎসবে এই দরিদ্রের দল নিমন্ত্রণ পাইয়া কৃতার্থ হয়।

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane, and Printed by K. Lahiri, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

কল্লোল

মাঘ, ১৩৩৪

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবন প্রাশ ৩৲সের

মকর ধ্বজ ৪৲তোলা

স্থাপিত ১৩০৮ সন

কারখানা ঃ—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা

হেড আপিস ঃ—পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতা হেড আপিস ঃ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ—১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২২ হ্যারিশন রোড, ৭১।১ রসা রোড, ভবানীপুর

—অন্যান্য শাখা—

ময়মনসিংহ মান্দ্রাজ চট্টগ্রাম চাঁদপুর লক্ষ্ণৌ জলপাইগুড়ি বগুড়া শ্রীহট্ট সিরাজগঞ্জ রাজসাহী
রঙ্গপুর কাশী এলাহাবাদ মেদিনীপুর গৌহাটী পাটনা বহরমপুর নারায়ণগঞ্জ
মাদারিপুর ভাগলপুর কানপুর রেঙ্গুন গোরক্ষপুর নেত্রকোণা

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

দশন সংস্কার চূর্ণ—৵০ কৌটা

এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্তরোগ ও নানাবিধ মুখ-রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ খদির বটিকা—৵০ কৌটা—

পানের সহিত ২.৩ বার করিয়া সেবন করিলে দন্ত সুদৃঢ় হইবে, দন্তের সকল প্রকার রোগ নষ্ট করিবে। মুখে সুগন্ধ বাহির হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত ক্যাটালগ, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর বাহাদুরের অভিমত এবং দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য মহোদয়গণের বিশেষ অভিমত ও প্রশংসাপত্রাদি এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিবিষ্ট পুস্তিকা পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়।

টেলিঃ—শক্তি ঢাকা

প্রোপাইটার—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি, এ, (রিসিভার)
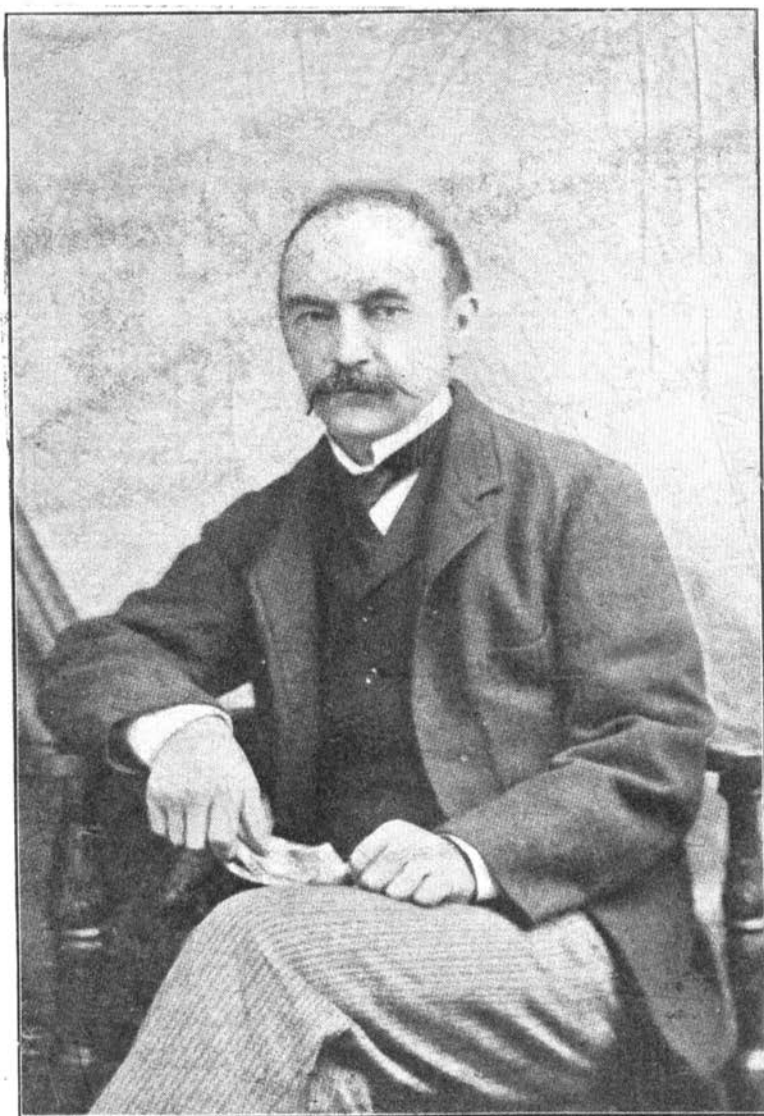
টমাস্ হার্ডি

[জন্ম—২রা জুন, ১৮৪০, মৃত্যু ১১ই জানুয়ারী ১৯২৭]

পঞ্চম বর্ষ
মাঘ, ১৩৩৪

আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি, শুধাই তোমারে ভাই,
হেরিছ তেমনি তা'র দুই চোখে বসন্ত-বাসনাই ?
কোন্ নামে তা'রে ডাক' ?
তোমারো আকাশে ফুটিয়াছে তারা তেমনি কি লাখো লাখো ?
তোমরা দু'জনে মাঠের কিনারে তেমনি কি থাক' বসি',
তোমাদের দেশে তেমনি কি আসে চৈতের চৌদশী ?
শয়ন-শিয়রে রজনীগন্ধা ফেলিছে কি নিঃশ্বাস,
নিরালা জাগিয়া দু'জনে তেমনি ভুঞ্জিছ অবকাশ ?
আমারে বলিবে না কি ?—
তেমনি কোমল দু'টি করতল, শীতল তেমনি আঁখি ?
তুমি না চাহিতে অধর আনিয়া অধরে কি আর রাখে,
বারেক আধেক 'ভালবাসি' বলে' তেমনি কি থেমে থাকে ?
রঙীন বসন পরি'
তোমারে তুষিতে খোঁপায় গোঁজে কি ধান্যের মঞ্জরী ?
নব নবনীর মত সুকোমল তার দু'টি পয়োধরে
সঞ্চিত করি' রাখিয়াছে সুধা তোমার শিশুর তরে ?
আর কি বেহাগ গায় ?
তোমার চোখে কি আমার চোখের জলের আভাস পায় ?

———

মায়ে-পোয়ে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

বিধবা মায়ের এক ছেলে—গভীর অমাবস্যার শেষ যামের শুকতারা।

ছেলে বড় হয়, মা তাকিয়ে দেখেন। তাঁর প্রতীক্ষার দিনগুলো যেন এক একটা করে কমে আসে।

ছেলে বড় চাকরী পায়; প্রতিবাসী এসে প্রশংসা করে—সার্থক ছেলে গর্ভে ধরেছিলে মা।

এ কথায় মায়ের চোখে জল ভরে আসে। এই ছেলেরই উজ্জল ভবিষ্যতের আশা-আনন্দ নিয়ে কত দীর্ঘরাত নিমিষের মত কাটিয়ে দেওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ে। বিগত যৌবনের উচ্ছল মদির মুহূর্ত্তগুলি! ছেলের পাশে আর একখানা প্রিয় মুখ ভেসে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে।

মা বলেন—'বিয়ে কর্ বাবা।'

ছেলে উত্তর দেয়—'বেশ ত আছি মা, মায়ে-পোয়ে। তোমার স্নেহ চিরকাল একলা ভোগ করে আসছি, এখন আর ভাগীদার জোটাতে পারব না।'

সামনের বাড়ীর শাশুড়ী-বৌয়ের চুলোচুলির দৃশ্যটা সে কল্পনা করে শিউরে ওঠে।

মায়ের প্রাণ যুক্তি মানে না। ছেলের বিয়ে দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য। ছোট্ট টুকটুকে একটা মেয়ে পাওয়ার লোভও ত কম নয়। আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে, ফায়ফরমাজ খাটবে, বিরক্ত করবে, ভুল করে বকুনি খাবে। আবার মায়ের আদরে খুসী হয়ে উজ্জল হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন—'যতীন, বাবা, বাড়ী বড় ফাঁকা লাগে যে।'

ছেলে বোঝে—অভাবের জালবোনাই মানুষের স্বভাব। শুধু ছেলেয় পেট ভরে না; বৌ চাই। সে হাসে, তর্ক করে, শেষে সম্মত হয়; আবার বলে—'কিন্তু মা, শাশুড়ী-বৌতে না ব'নে যদি?'

'পাগল কোথাকার!'

মায়ের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। যতীন বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ী এল। বধূ-বরণের সময় মায়ের চোখে সে কি অপার্থিব জ্যোতিঃ। মায়ের খুসীতে ছেলের বুক আনন্দে ভরে গেল, আর তারই ছোঁয়াচ লেগে চারিদিক লাবণ্যে ভরে উঠল। বৌ ত নয়, যেন কালো দীঘির বুকের নিরালা পদ্ম—সমস্ত জলের কালোটাকে মাধুর্য্যে সজীব করে রেখেছে।

ভুল হয়, কাজেই গোল বাধে।

ছেলের বৌ দেখতে ছেলের বন্ধুরা আসে, কথা কওয়ার জন্যে বৌকে পীড়াপীড়ি করে। বৌ কথা কয় না।

বন্ধুরা ইঙ্গিত করে—'মায়ের ভয়ে বুঝি?'

যতীন প্রতিবাদ করে, বলে—'মা সে রকম নন; তাঁর কোনও আপত্তি নেই।'

বন্ধুরা বিশ্বাস করে না। যতীন তর্ক করে এটা প্রতিপন্ন করে।

বৌ বাড়ীর ভিতরে গেলে মা প্রশ্ন করলেন—'কার্ কার্ সঙ্গে কথা হল বৌ-মা?'

মায়ের মুখ ভার, স্বর অপ্রসন্ন।

বৌ লজ্জায় ভয়ে ঘামে, উত্তর দিল—'কথা ত কই নি মা।'

মা ভাবলেন—মিথ্যে কথা!

ছেলে এসে বল্লে—'তোমার কি হল মা? মুখভার করে রয়েছ যে?'

'কি আর হবে? তোরা এখন বড় হয়েছিস তাই—'

ছেলের মন তৃপ্তিতে ভরা। সে হেসে গড়িয়ে পড়ে—'কি যে বল মা? চিরটাকালই বুঝি তোমার কোলে শুয়ে দুধ খেতে হবে?'

মায়ের মনে হয়—সেই বুঝি ভাল। অসহায়কে একান্ত ভাবে পাওয়াই ত প্রকৃত পাওয়া। ছেলের স্বাধীনতা কেমন যেন ভালো লাগে না।

রাতে বৌ বল্লে—'ওঁদের সামনে ত টেনে নিয়ে গেলে, মায়ের অনুমতি নিয়েছিলে?'

যতীন তাচ্ছিল্যস্বরে উত্তর দিল—'ভারি ত কাজ, তার আবার অনুমতি!'

বৌ আরও কিছু এ নিয়ে বলতে চায়, বলতে পায় না। তার ওষ্ঠাধরের পথ যতীনের ওষ্ঠাধরের চাপে বন্ধ হয়ে যায়। সে রাঙা হয়ে হাঁফিয়ে ওঠে, ঢল ঢল কচি মুখখানা সরিয়ে নেয়, মিটিমিটি হাসে, সব কথা ভুলে যায়।

ছেলেমানুষ বৌকে সুখে ও আরামে রাখার জন্য মা খেটে সারা হন; বৌকে একটা কাজও করতে দেন না। বৌ কাজ করতে গিয়ে বকুনি খায়—'আঃ পোড়ামুখি, কপালের টিপখানা কোথায় ফেলে দিয়েছিস? টিপ ঠিক রাখতে পারে না আবার কাজ করতে চায়!'

বৌ না-ছোড় হলে বলেন—'যে ক'দিন আমি আছি তুই হেসে খেলে বেড়া মা। কাজ করার ত আস্তকালই পড়ে রয়েছে।'

মায়ের বধূকালের দিনগুলো মনে পড়ে। বৌকে কোলে টেনে এনে চুমু খেয়ে তেল-সাবান দিয়ে তাকে স্নান করতে পাঠান।

যতীন বলে—'মা, তুমি মরবার দাখিল হলে খেটে খেটে, বৌকে একটু—'

তার কথা শেষ হতে পায় না; মা তাড়া দেন—'তোর সর্দ্দারি করতে হবে না, যা।'

দু'মাস যায় চারমাস যায়, মায়ের মনে ক্লান্তি এসে জমল। তিনি যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই কামনা করে বসেন—বৌ তাঁর সুখ ও আরামের দিকে স-জাগ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারেন না।

যতীন রাতে খাওয়ার পর শুতে গেলেই মা বৌকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দেন। তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে একটুও অপেক্ষা করতে দেন না। তিনি বেশ দেখতে পান—যতীন যেন উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে; তার চোখে ঘুম আসছে না। তাঁর মুখে হাসি আসে; মন উড়ে যায়—অনেক বছর আগেকার রাতের খাতার পাতায়।

বৌ শুতে গেলে নিজের সামান্য জলখাবারটুকু গুছিয়ে নিতেই তাঁর আর আলস্যের অবধি থাকে না। কত বছরের শ্রান্তি তাঁকে পেয়ে বসে—দিনের কর্ম্মাবসানে, রাতের এই নির্জ্জন অবসরে।

এই শ্রান্তিটা তাঁর দিনের পর দিন বেড়ে চলল। যতীন একদিন সকালে উঠে মায়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—'মা, তুমি যেন একটু রোগা হয়ে গেছ। রাতে জলটল খাওয়ার পাট তুলে দিয়েছ নাকি?'

'তা যে-দিন কুড়েমি ধরে না, খাই বই কি!'

শুনে ছেলে অবাক হয়, বৌ অস্বস্তি বোধ করে। কথাটা বলে ফেলে মাও লজ্জিত হন।

দিন যায়। বৌ ক্রমে একটু একটু করে সংসারের কাজ ঘাড়ে তুলে নিল। মাও নিশ্চিন্ত হয়ে পূজার্চ্চনায় মনোযোগ দিলেন।

শেষে একদিন হঠাৎ মায়ের মুখভার দেখে যতীন প্রশ্ন করল—'মা, বৌ কি কোনও অপরাধ করেছে?'

ছেলের এ প্রশ্ন মায়ের ভালো লাগল না। মনে হল—বৌয়ের দোষ ঢাকার জন্যে ছেলে বুঝি ব্যাকুল, আর তিনি যেন অনাত্মীয় কঠিন বিচারক। ভাবেন—রাতের শেষের শুকতারাই আমার ভালো ছিল দিনের প্রখর রোদের চেয়ে। রাতের সঙ্গে শুকতারার আত্মীয়তার কথা ত সূর্য্য জানতে চায় না।

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে যতীন আবার বলল—'বৌ অপরাধ করলে তাকে সমঝে দাও। তোমাদের নতুন পরিচয় ত বটে; পরস্পরের বোঝাবুঝির মধ্যে ভুলও ত হতে পারে।'

মায়ের বুকটা জলে পুড়ে ওঠে। উষ্ণ হয়ে উত্তর দেন—'বৌর দিক টেনে কথা বলছিস? তা ত বলবিই! এখন ত আমি—যাক্ ক'টা দিনই বা আর আছি? তোরা সুখে থাকলেই ভাল।'

মা চোখে আঁচল চেপে ছুটে চলে যান। ছেলে হতবুদ্ধি হয়ে অকারণে বৌকে তাড়না করে বলে—'মাকে খুসী রাখতে পারে না, এমন বৌ আমি চাই নে।'

বৌয়ের নির্য্যাতন দূর থেকে দেখে মা মনে কষ্ট পান, ছেলেকে নিবৃত্ত করতে আসতে আসতে মাঝপথে থমকে দাঁড়ান।

অপরাধ বুঝতে না পেরে জল ছলছল চোখে বৌ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যতীন নিরপরাধ বৌয়ের চোখের জল সইতে পারে না, হাত ধরে ঘরের কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়, চুমু দিয়ে তার সকল অশ্রু শুকিয়ে তোলে। বৌ খুসীতে বিহ্বল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে—সূর্য্যের আলোর প্রথম পরশ পাওয়া বিকশিত শতদলের মত।

বৌয়ের মুখের হাসির রেশ মায়ের প্রাণের তারে বেসুরো হয়ে বাজে।

পাড়াপড়শীদের সহানুভূতিতে গোল্‌টা ভালো করে পেকে উঠল। মা বল্লেন—'ছেলে যেন পর পর।'

পড়শীরা বল্লে—'এ ত জানা কথাই। কলিকালের ছেলে!'

যতীন এসে পড়লেও আলোচনাটা সম্পূর্ণ থামল না। যতীন প্রচণ্ড অভিমানের রুদ্ধ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত চুপ করে থাকতে না পেরে বল্লে—'যে কাজ তোমার অপছন্দ হয় মা, সাবধান করে দিলেই ত পার।'

মায়ের চোখে জল এল, সকলকে সাক্ষী মেনে বল্লেন—'দেখলে ছেলের আক্কেল!'

যতীন বল্লে—'অন্যায় ত কিছুই বলি নি মা। মনগুমরে না থেকে তোমার বউ তুমি শাসন করলেই পারো। সেইটেই ত উচিত।'

'বৌ যদি না শোনে।'

'এমন ত কোন দিন হয় নি।'

'তোমার বৌ আমি শাসন করব?—হয়েছে! একটা কথা তোমার গায়ে সয় না।'

'কেন মা? কোন্ কথাটা সয় নি?'

'আজকের এইটেই সইল না। মনে নেই—বিয়ের পরে বন্ধুদের সামনে বৌকে বের করে—সেও ত আমার এক রকম অপমান! তার পরে সেদিন মুখভার করেছিলাম বলে বৌর হয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিলি!'

পড়শীরা সায় দিল। যতীন অভিমানে অপমানে আত্মহারা হয়ে পড়ল; বল্লে—'এখন তবে ব্যবস্থা কি?'

মা উত্তর দিলেন—'তোমার বৌ তোমার সব, তুমি যা হয় করো। আমি দাসীবাঁদী বই ত নয়।'

যতীন বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

অকারণ অপরাধে লাঞ্ছিতা হয়ে বৌ বাপের বাড়ী গেল। তার রোরুদ্যমান মুখের দিকে তাকিয়ে যতীনের কান্নায় বুক ভরে এল। মায়ের উপর প্রচণ্ড অভিমানে সে যেন পাথর ব'নে গেল, অন্যায় করে বৌকে ও নিজেকে উৎপীড়িত করে মাকে শাস্তি দিতে চাইল।

মা খুসী হন, আবার হন না। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাঁকে নিরন্তর নিপীড়িত করতে থাকে। তিনি দু-চারবার বলেন—'বৌকে নিয়েই আয় না-হয়।'

'না-হয়' কথাটায় যতীন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। বৌ পত্র লেখে। সেগুলো পড়তে গিয়ে সে বুকে রাখে; চোখের জলে তার অক্ষরগুলো ভিজিয়ে তোলে—কিন্তু উত্তর দেয় না। মা দেখুন।

এর মধ্যে একদিন সে চাকরীতে বদলী হল—এক মাসের জন্যে। মাকে সে বাড়ী পাঠিয়ে দিল, বল্লে—'এক মাসের জন্যে আর বাসা করব না।'

ছেলে এক মাসের মধ্যে বাড়ী এল না দেখে মায়ের হল রাগ; ভাবলেন—ছেলে লুকিয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়। এ লুকোচুরির দরকার কি? তিনি যখন পথের কাঁটা, তখন তাঁর সরে যাওয়াই ভাল।

মা ছেলেকে পত্র লিখলেন—'বাবা, আমি কাশী যাব, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।'

পত্র পেয়ে যতীন বাড়ী এল, বল্লে—'চলো মা বাসায়। মনে করো আমার বিয়ে হয় নি। মা-ছেলেয় আমরা আগেকার মত থাকি।'

মা অনেক কিছু ভাবলেন, শেষে চোখের জল মুছে বল্লেন—'আমার কাশী যাওয়াই ভালো বাবা।'

যতীনের মনে পড়ে—তার জন্য মায়ের অসীম কষ্ট অসীম স্বার্থত্যাগ। সে তাঁর চোখের জল সইতে পারে না, জোর দিয়ে বলে—'তোমার যাওয়া হতে পারে না মা। কেন মিথ্যে মিথ্যে তীর্থের নামে ভণ্ডামি করতে যাবে? বিশ্বেশ্বরের পূজো করবে আর মন দৌড়ুবে তোমার আমার পাশে। সে হয় না মা!'

সত্যি কথা! মা অস্বীকার করতে পারেন না।

দিন যায়। ছেলের ঔদাসীন্য, একান্ত নিস্পৃহ ভাব মায়ের মনে ব্যথা দেয়। তিনি বল্লেন—'বাবা, তোর এ অবস্থা আমি চোখে দেখতে পারি নে। তুই ফের্ বিয়ে কর্।'

ছেলে উত্তরে বল্লে—'কেন মা? বেশ আছি!

মা বেশী পীড়াপীড়ি করে ধরলে বল্লে—'বিয়ে করেও ত একবার দেখেছি মা! আর কেন!'

এই সময়ে তার নিরপরাধ বৌয়ের কথা মনে পড়ে, চোখ দুটো ভিজে আসে। ছেলের চোখের জলে মায়ের বুক কেমন করে দুলে ওঠে, জমাট কান্নায় যেন কথা জড়িয়ে যায়। তিনি শেষে বল্লেন—'এবার ভালো দেখে বৌ আনব বাবা! ছোট-ঘরের মেয়ে নয়।'

যতীন হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এ অন্যায় সে হজম করতে পারে না, বল্লে—'অবিচার করো না মা! সেও ত তোমার মেয়ে।'

'বুঝেছি।' বলে মা চলে যান। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে আসে।

শেষে বৌয়ের মৃত্যু-সংবাদ বহন করে যে চিঠিখানা যতীনের কাছে এল সেখানা সে বুকে চেপে ধরে অনেক্ষণ কাঁদল। অনাদরে অবহেলায় অকারণে যে ব্যথা সয়ে সে গেছে তার তীব্র অনুভূতিতে যতীন ডুকরে উঠল। মনে পড়ে তার ফুলশয্যার রাতের নিটোল মুখে রক্ত-গোলাপের আভা, সরম-জড়িত চোখের অর্দ্ধস্ফুট গোপন চাহনি আর স্ফুরিত অধরের স-সঙ্কোচ আত্ম-নিবেদন। আরও মনে পড়ে তার বিদায়-দিনের অশ্রুসজল আঁখিদুটির মৌন আকুতি।

সকালে উঠেই সে চিঠিখানা মায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বের হয়ে গেল।

মা চিঠিখানা পড়ে কেঁদে উঠলেন, মনে মনে বল্লেন—'ঠাকুর এ কি করলে! আমি ত এ চাই নি।'

দু বছর কেটে যায়। মা ছেলেকে বিয়ের তাগিদ দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়ে শেষে হতাশ হয়ে কাশী চলে গেলেন। বাবা বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশ করে তাঁর মাথায় ফুলজল দিয়ে বলেন—'সেই ত পায়ে স্থান দিলে ঠাকুর, কেন সময় থাকতে দিলে না! বৌটা মরবার আগে আমায় যদি টানতে, তাহলে ত আর ছেলের কথা ভেবে সারা হতে হত না।'

যতীন চিঠি দেয়, লেখে—'ভালো আছি।'

মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। এক বছর কোন রকমে অপেক্ষা করে হঠাৎ শেষে একদিন যতীনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যতীনের রুগ্ন, শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন! ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে অনুরোধ করে বল্লেন—'বাবা, তুই ফের্ বিয়ে করে সংসারী হ। আমি এ যে আর সইতে পারি নে।'

ছেলে অতি দুঃখে হাসল, বল্লে—'ক্ষমা করো মা। তোমার চোখের জলে আমার অকল্যাণ হবে; কিন্তু তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।'

রাগ করে মা কাশী ফিরে গেলেন; বাবা বিশ্বেশ্বরের পূজা করেন আর বলেন—'তুমি আমার সব বাঁধন খসিয়ে দিয়ে উদ্ধার করলে ঠাকুর! ছেলে! ছেলে! ছেলে—সব মায়া-রাক্ষস, ধর্ম্মপথের কাঁটা। এ মায়া-কণ্টক আমি আর রাখব না। ছেলের চেয়ে ধর্ম্ম ঢের বড়। পরলোকে ত আর ছেলে সাক্ষী দেয় না।'

পরলোকে ছেলে সাক্ষী দিক আর না দিক—ধর্ম্মচর্চ্চার ফাঁকে ফাঁকে রাতের নিভৃত অন্ধকারে মায়ের চোখে যে জোয়ার নেমে আসে, তাকে আর ধর্ম্মকর্ম্মের কোনও সান্ত্বনা দিয়েই তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না।

স্বীকার

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

(পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

কাল রাত্রে প্রীতিনাথের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। শবদাহান্তে প্রত্যুষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে মুহ্যমান হইয়া ইজিচেয়ারটাতে দেহ এলাইয়া পড়িয়া ছিল। স্ত্রী তাহার কি না ছিল? তাহাদের অনটনের সংসারও তাহার মঙ্গল হস্তের নিপুণ স্পর্শে সর্ব্বদা কি না মঙ্গলশ্রীতে প্রোজ্জল হইয়া থাকিত। বাড়ীর ঝি-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা পর্য্যন্ত সবাই বৌ-মা বলিতে অজ্ঞান। সে যেন অফুরন্ত মাধুর্য্যের উৎস। তাই কি প্রীতিনাথ সেই অফুরন্ত মধুরতার শেষ খুঁজিতে গিয়া কোনদিন যেন তার শেষ পান নাই? তাঁহার এই অনুসন্ধানের চেষ্টায় কোথায় যেন ব্যর্থতার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিত। সুনীতিকে তিনি যেন সমগ্রভাবে ধরিতে পাইতেন না। শূন্যমনে প্রীতিনাথ কত কথা ভাবিতেছিলেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে লজ্জাভরণা সুনীতি রাঙা চেলি পরিয়া বধূরূপে তাঁহার ঘরে আসে। তারপর সুখে দুঃখে কতদিন কাটিয়া গেল;—তিনি এক পুত্র এক কন্যার পিতা হইলেন। পুত্রটি ফাঁকি দিয়া পলাইল—তারপর সবাইকে প্রীতিধারায় অভিষিক্ত করিয়া—আজ আবার সবাইকে কাঁদাইয়া—চার বৎসরের বালিকা শ্রীলেখাকে রাখিয়া সুনীতি পলাইল।

... হঠাৎ প্রীতিনাথের দৃষ্টি র‍্যাকের উপর সুনীতির হাত বাক্সোটার উপর পড়িল। সেটাতে তাহার কাগজ-পত্র দোয়াত-কলম, চুলের ফিতা খোঁপার-কাঁটা, সূঁচ-সুতা, সিঁদুর কৌটা—আরো কত কি থাকিত। কাল সন্ধ্যাবেলা সুনীতি আঁচল হইতে ঐ বাক্সটার চাবিটা তাহাকে খুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'আমি মলে ঐ বাক্সটা তুমি রেখে দিও, আর কাউকে খুলতে দিও না।' প্রীতিনাথ জবাব দিয়াছিলেন, "ছিঃ নীতি, তুমি ভালো হয়ে উঠ্‌বে!" উত্তরে সুনীতি মুখ ফিরাইয়াছিল! প্রীতিনাথ বাক্সটা নামাইয়া কোলের উপর রাখিলেন,—পরে খুলিয়া এটা সেটা নাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের পাতা বারবার ভিজিয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ কাগজপত্রের নীচে একখানা খামের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তাহাতে শিরোনামা লেখা রহিয়াছে,—"শ্রীযুক্ত প্রীতিনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু" — সুনীতির হস্তাক্ষর! বিস্মিত হইয়া খাম ছিঁড়িয়া প্রীতিনাথ পত্রখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেখানা এইরূপ;—

তেরই ভাদ্র

মঙ্গলবার, ১৩ —

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

আমি জানি আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। ডাক্তার যে কাল জবাব দিয়ে গেছে তা আমি ছকুর কাছ থেকে শুনেছি। ছকু ছেলেমানুষ, তাকে বকো না। যাক্‌,—তাই তোমায় এ পত্র লেখা। সারাটা জীবন—আমাদের বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ নয় বৎসর—তোমায় ভাঁড়িয়ে এসেছি; এ প্রতারণার জের আর জীবনের পরপারেও টেনে নিয়ে যেতে চাই নে। কারণ, যে মনের দৌর্ব্বল্য সমাজের লাঞ্ছনা ও আত্মীয়ের গঞ্জনার ভয়ে এতকাল তোমার পরমস্নেহের সামনেও মিথ্যা বল্‌তে পেছোয় নি,—তার পরোয়া আর এখন তো করবার কারণ নেই, কেন না—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হয় তো এ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সব লুপ্ত হয়ে যাবে। মাথা আমার বড় টন্‌টন্‌ করছে, হাত এলিয়ে আসছে, তবু যে-করে হোক আমাকে

এ চিঠি শেষ করতেই হবে। নইলে এমন সুযোগ আর হবে না। তুমি বাড়ী নেই ওষুধ আনতে গিয়েছো; আমি কপাট বন্ধ করে মাকে বলে দিয়েছি আমি বেশ আছি, আমায় যেন এখন কেউ এসে বিরক্ত না করে।

যাক, বাজে কথা কইবার সময় আমার নেই। তোমার মনে পড়ে অরুণের কথা,—ঐ যে আমি অরুণ-দা বলে ডাকতাম, আমাদের গাঁয়ে বাড়ী—গত বছর ফ্রান্সে গিয়ে যুদ্ধে মারা গেছে। তুমি তাকে ভালো করেই জান্‌তে। মনে পড়ে তুমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলে, 'অরুণ যেন অরুণেরই মত ভাস্বর—যেন একটা আগুনের হল্‌কা'। তখন সে এম্‌-এ পড়ে। রমেশ আচার্য্যের ছেলেকে আগুন-লাগা-ঘর থেকে বাঁচাতে নিজের দু'খানা পা একেবারে পুড়িয়ে তবে ছেড়েছিলো,—তাতে চারমাস ভোগে।... ঠিকই বলেছিলে!

তুমি জানো যে, তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল,—এও জানো কেন সে সম্বন্ধ ফের ফিরে যায়। কিন্তু এ কথা তুমি জান্‌তে না যে, আমি তাকে ভালো-বাসতাম, সেও আমাকে ভালোবাসত—উন্মাদের মতো ভালোবাসত। এ ভালোবাসা মুহূর্ত্তের দৃষ্টিবিনিময়ে হয় নাই; আবাল্য সাহচর্য্যের ফলে আমাদের প্রত্যেক অস্থিতে মজ্জায় অণুতে পরমাণুতে এ ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়েছিল, প্রতি রক্তবিন্দুতে তার মোহের ছিট ছিল, মাধুর্য্যের প্রক্ষেপ ছিল। কেউ কেউ বলবে, তবে আমি আর কাউকে বিয়ে করেছিলাম কেন? কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বিয়েতে কি কোনো উচ্চবাচ্য করা চলে, না আমাদের তেমন বয়সেই বিয়ে হয় যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা বা সামর্থ্য অর্জ্জন করে থাকি? আমার আর এক উপায় ছিল—মরা। কিন্তু সে পথ নিলেই কি কেউ সায় দিত? তা ছাড়া মরবার সাহস আমার ছিল না।

আমার বিয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেখ্‌লাম, অরুণ বেশ সাম্‌লে নিয়েছে। একদিন সে আড়ালে পেয়ে বল্লে, "সুনীতি, এই-ই ভবিতব্য। আমি মানুষের মতো একে সইতে চেষ্টা করব তুমিও কোরো। আমাদের এ ঘনিষ্ঠতার কথা মনে করে তোমার যেন কোনো গ্লানি না আসে। তখন তো আমরা জানতাম না এমন হবে। স্বীকার যখন করতে বসেছি তখন সবই বল্‌ব—পূর্ব্বে তার আমায় সোহাগ করবার ক্ষিপ্রতা দেখে মাঝে মাঝে ভয় হোতো; কিন্তু আজ তার এই শান্ত ভাব দেখে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না। আমি তার জবাবে শুধু বল্লাম, "চেষ্টা করব।"

তোমার ঘরে তো বাধ্য শিশুটির মতো সমাজের শাসন মান্‌তে এলাম। অরুণ তখন বি,এ, পড়ত। তারপর এম্‌,এ, পাশ করে পশ্চিমে কোথায় চাকরী নিয়ে চলে গেল। তোমার ঘরে নকল হাসির ফোয়ারায় সকলকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলাম,—কিন্তু তোমায় পেরেছি কি? চরম অশান্তির মুহূর্ত্তগুলার মাঝে মাঝে প্রায় তোমার কাছে ধরা পড়ে যেতাম—বিরক্তিতিক্ত দু'একটা কথায় অকারণ দু'একটা দীর্ঘশ্বাসে, আচম্বিতে জলভরে-আসা চোখ লুকোবার চেষ্টায়। আমি দেখেছি তুমি তা লক্ষ্য করেছো কিন্তু বোঝো নি।

... তখন আমি বাপের বাড়ীতে। ছয় বছর পরে অরুণ হঠাৎ দেশে ফিরল। সবাইকে বল্লে, চাকরী করতে ভালো লাগে না, তাই ছেড়ে এলো। ছেলেটা মারা যাবার পর শ্রীলেখা মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একদিন ওকে দেখে অরুণ বল্লে, "তোমার শ্রীটি ওতে সম্পূর্ণ ফুটেছে—ওর নাম রাখো শ্রীলেখা।" মা সামনে ছিলেন, বল্লেন, "বেশ নামটাতো ঠাউরেছিস্‌ অরুণ, আমি ওকে শ্রীলেখা বলেই ডাকব।" শ্রীলেখাই খুকীর নাম হয়ে গেল। তোমরা জানতে ও-নাম মা রেখেছেন।

অরুণের চোখে প্রথম দিন চেয়েই টের পেয়েছিলাম যে, আমায় ভুলতে পারা দূরের কথা, কি জ্বলুনি সে জ্বলছে। আমি নিজেকে যথেষ্ট সাম্‌লে চল্‌তাম, কিন্তু অরুণের তৃষিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না। আমার অন্তরাত্মাই তাকে সাহস দিয়েছিল, নইলে এমন সাহস তার হবে কি করে, তা যত বড় ক্ষ্যাপাই সে হোক। প্রায়ই আমায় নির্জ্জনে পেলে তার প্রবাস-জীবনের কত সুখদুঃখের কাহিনী এম্‌নি অনুরাগের সঙ্গে সে

বল্‌তে সুরু করত যে, আমি নানান্ ছুতায় পালিয়ে বাঁচতাম। একদিন তার কথায় বলে ফেল্লাম, "আমায় এ সব বলে লাভ পাও কি অরুণ-দা?" এ কথা শুনে অরুণের মুখে আঁধার ঘনিয়ে এলো। একটু পরে ঢোঁক গিলে আমায় বল্লে, "কেন, তুমি কি বিরক্ত হও?"—"যদি হই-ই"—"আমি তা ভাবতে পারি নি, কিন্তু যদি হও-ই তো আর না বল্‌তে চেষ্টা করব।" আমি তাড়াতাড়ি কথাটাকে পাল্টে বল্লাম, "আমি বিরক্ত হই-না-হই, কিন্তু তোমার এতে কি লাভ?" দেখলাম অরুণের বুকটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, সে আস্তে আস্তে বল্লে, "তা তোমারই বা জেনে কি লাভ?"—একটু থেমে ফের বল্লে, "ভাবছিলাম বল্‌ব না, কিন্তু পারলাম না, তুমি আমায় বলিয়ে ছাড়লে,—তোমায় বল্‌তে যে আমার ভালো লাগে তা কি তুমি বোঝো না?" ঠিক যা ভয় করছিলাম তাই হোলো; কোথায় ভেবেছিলাম এ প্রসঙ্গের মুখে পাথর চাপা দেবো, তা না হয়ে যা একটু আবরণ ছিল তাও খ'সে গেল। আমি অপ্রস্তুত হলেও বাইরে তা লুকিয়ে একটু ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিলাম, "অরুণ-দা, তোমায় কোনো কথা বলবার জন্য কোনোদিন মাথার দিব্যি দিয়েছি বলে তো আমার স্মরণ হয় না; তা ছাড়া গণৎকার নই যে, তোমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে জানব তোমার কিসে ভালো লাগে না লাগে; যাক্, আমার কাজ আছে, আমি চল্লাম।" অরুণ শান্তস্বরে জবাব দিল, "যাও। কিন্তু তোমার কাছে এ কথা লুকোবার আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না যে, তুমি এখনও বুকের কতখানি জুড়ে আছ। তাতে তোমার অপমান হবে না। তোমার স্মৃতি সম্বল করে আমি এই দীর্ঘ ছয় বছরের মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে শিখেছি, বিপদকে—'

আমি হাত তুলে তীব্রস্বরে বল্লাম, "চুপ কর অরুণ-দা,—আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই না! এ কথাগুলা আমায় বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হচ্ছে না? — অসচ্চরিত্র!"

অরুণ চম্‌কে উঠ্‌ল, দেখলাম তার মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছে! সে চেঁচিয়ে বল্লে, "কী! তুমিও আমায় এ কথা বল্‌বে? আমার ভিতরের হিংস্র পশুটাকে বশ করে এনেছিলাম, কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না দেখছি। সুনীতি, তোমার কথা ফিরিয়ে নাও! কিসে—কিসে তুমি আমায় একটু সহানুভূতিরও অযোগ্য মনে কর সুনীতি?" গলার আওয়াজে তার শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে মিনতির কাতরানি যেন মাথা খুঁড়ে মরছিল। আমি সদর্পে পা বাড়িয়ে বল্লাম, "তুমি তারো অযোগ্য।" পিছন থেকে অরুণ ডাক্‌লো, "শোন সুনীতি, যেয়ো না,—যেয়ো না বল্‌ছি!" রুদ্ধরোষ ও কাতর অস্থিরতার কি বিচিত্রধ্বনি সে স্বরে ফুটে উঠছিল! আমি চলে এলাম।

তারপর দিন দশেক অরুণের দেখা পাই নি। আমার এ ক'দিন কেমন কেটেছে তা আর বল্‌তে চাই নে। তারপর সেদিন মা'র আহ্নিকের জল নিয়ে নদীর ঘাট থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরছি—হঠাৎ মধ্যপথে বটগাছটার তলায় অরুণ পথ আগলে দাঁড়াল। তার চেহারা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। এ ক'দিনে চেহারার এত পরিবর্ত্তন হতে পারে আমার ধারণা ছিল না! চুলগুলা সব এলোমেলো রুক্ষ,—গাল দুটো বসে গিয়েছে,—চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল,—যেন একটা মূর্ত্তিমান উন্মাদ! পথ আগলে শুক্‌নো হাসি হেসে সে বল্লে, "সে দিন যে বড় পালিয়েছিলে,—আজ?—"

"ছিঃ, পথ ছাড়, লোকে দেখলে কি বলবে —"

সে তেমনি হেসে জবাব দিলে, "ভয় নাই,—কেউ মনে করবে না যে তোমার কাছে প্রেমভিক্ষা করছি।"

"কি যে বল অরুণ দা তার ঠিক নেই—" একটা কড়া কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কেন যেন ঠোঁট দিয়ে বেরুল না।

"আজ তোমায় বলে যেতে হবে আমায় কতখানি ঘেন্না করতে শিখেছো,—সত্যিই আমি এতটুকু করুণারও যোগ্য নই কিনা—"

আমি চুপ করে রইলাম। একটু পরে চেঁচিয়ে অরুণ বল্লে, "জবাব দাও—"

আমি এবার মুখ তুলে শুধু বল্লাম, "আমি কিছুই বল্‌তে পারবো না।"

"তোমায় বল্‌তেই হবে।"

"সর, যেতে দাও"—বলে এবার আমি যেই পা বাড়ালাম লাফিয়ে অরুণ এসে আমার ডান হাতখানা এমন জোরে চেপে ধরলে যে, আমার বোধ হচ্ছিল যে, হাতখানা বুঝি ভেঙ্গে গেল। তার বজ্রমুষ্টির চাপে সে হাতের শাঁখাগাছি মট্‌মট্‌ করে চার টুকরা হয়ে মাটীতে খসে পড়ল। আমি বললাম, "ছাড়, লাগে!"

"হাত ভেঙ্গে গেলেও ছাড়ব না, সাফ্ কথা! তোমায় আজ বলতেই হবে—বল।"

এর উত্তরে যখন আমি "উঃ বাবারে" বলে মাটীতে বসে পড়লাম,—তখন যেন তার খেয়াল হোলো। অরুণ হঠাৎ হাত ছেড়ে দিলে দেখলাম তার দু'গাল বয়ে জল ঝরছে। সে আর কিছু বল্লে না,—ভাঙ্গা শাঁখার টুকরা ক'গাছি ধীরে ধীরে কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।... আমি বাড়ী ফিরলাম।

তারপর তিনমাস আরও বাপের বাড়ী ছিলাম, অরুণ একটী কথাও আমার সঙ্গে কয় নি। রওনা হয়ে আসার দিন মা বল্লেন, "বাবা অরুণ, স্থনীতিরা আজ চলে যাচ্ছে, ওদের ষ্টেশনে একটু তুলেটুলে দিয়ে আসিস্ বাবা।" ষ্টেশনে তার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। না—না এক মুহূর্ত্তের জন্য আর একবার দেখা হয়েছিল, কিন্তু সে কথা পরে বল্‌ছি। ষ্টেশনে সে ত্রস্তে বিদায় নেওয়ার সময় হঠাৎ পকেট থেকে ঝন্‌ঝনিয়ে কয়েকটা টাকা পয়সা মাটীতে ছড়িয়ে পড়ল,—তুলতে গিয়ে আমার পায়ে যেন তার মাথাটা ঠেকে গেল, আমি ত্রস্তে সরে বসলাম,—প্রণামটাও করলাম না। তখন যদি জানতাম ...।

তারপর বছর ঘুরল। অরুণের এর মধ্যে আর কোনো খবর পাই নি। মা'র পত্রে জেনেছিলাম, অরুণ ফের গাঁ ছেড়েছে, কোথায় আছে কেউ জানে না।

সেদিন তুমি তখন অফিসে গিয়েছ। আমি মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে ওর গোটাদুই পায়জামা সেলাই ক'রব ভেবে কাঁচিটা আনবার জন্য তোমার বস্‌বার ঘরে গিয়েছি, এমন সময় দেখি কে ফটক খুলে দ্রুতপদে ঘরের দিকে আস্‌ছে। একটু পরে তাকে চিন্‌লাম—সে অরুণ। হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ এমন জোরে ধক্‌ধক্ করে উঠ্‌ল,—আমার হাত-পা এমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল যেন আমি টলকে পড়ে যাবো। আমি সাম্‌লে নিতে না নিতেই অরুণ সোজা ঘরে ঢুকে, আমায় দেখে থম্‌কে দাঁড়াল এবং মুহূর্ত্ত পরে একটু শুষ্কহাসি ঠোঁটের কোণায় টেনে এনে বল্লে, "তোমাকে এত সহজে পাব এ ভাবি নি। যাক্,—এ চিঠিখানা পড়ে দেখো, না পড়েই যেন ছিঁড়ে ফেলো না।" একখানা চিঠি সে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ফের যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। আমি একটা কথা কইবারও অবকাশ পেলাম না। তাকে দু'দণ্ড থাকতে বলতেও মুখফুটে কথা সরল না, কেন না propriety জিনিষটা আমাদের এত রপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, ভুলেও আমরা তার ব্যত্যয় করি না।... অরুণের চিঠিটা এ চিঠির মধ্যে আছে, পড়ে দেখো।

অরুণের চিঠি

বাঁকীপুর
তারিখ—খেয়াল নেই
ঠিকানা —নং ফোর্ট ষ্ট্রীট, দিল্লী

কল্যানীয়াসু,

কতদিন কতবার তোমায় একখানা চিঠি লিখে শেষ বিদায় নেবো ভেবেছি, কিন্তু আখেরীর নিষ্ঠুর যবনিকাটা টেনে দিতে পেরে উঠ্‌লাম কৈ। তুমি হয় তো মনে মনে হাস্‌ছ, আমিও ভাবি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলাম কেন, এটুকু দৃঢ়তাই যদি প্রাণে নেই।

কিন্তু এ মর্ম্মন্তুদ খেলার অবসান করে তুমিই ইচ্ছা করলে দাঁড়ি টেনে দিতে পারতে, কিন্তু তা-ও যে দাও না!

তোমায় সেদিন বল্‌তে যাচ্ছিলাম, আমার জীবনে যা-কিছু ভালো, এবং যা-কিছু মন্দ তা-ও এ সুদীর্ঘ ক' বছরে ফুটে উঠেছে তোমাকেই অবলম্বন করে। 'ভালো'-টুকু খুঁজে পাওয়া মুস্কিল,—হয় তো অতি যৎসামান্যই আছে,—তবু লোকে বলে 'দোষেগুণে মানুষ', তাই যা

একটু ভালোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। মন্দের ভরাও তো তোমার অজানা নেই,—অসংযমের চূড়ান্ত—যার পরিণতি হয়েছে গিয়ে মারী-অঙ্গে আঘাত করা পর্য্যন্ত। কিন্তু এই যে উন্মত্ততার খরস্রোত, এটা বেড়েছে তোমার দোটানার মাঝে পড়ে। যদি জানতাম আমার জন্য তোমার হৃদ্‌কন্দরে স্নেহকণিকার একটুও সঞ্চিত আছে এখনও,—তবে দেখতে তোমায় আমি আর এমনি ভাবে বিরক্ত করতাম না, কারণ সেটা আমার দুর্লভ লাভ হতো! দুর্লভ জিনিষের একটু পেলেই লোকের আনন্দ ধরে না। আমি জানি সে ভাবটা তোমার থাকা এখন সম্ভব নয়। কারণ রূপবান্ গুণবান্ সর্ব্বোপরি স্নেহবান্ স্বামী পেয়েছো—যাকে দৈব দুর্ব্বিপাকে একদিন অভিশাপরূপেই কল্পনা করেছিলে, মনে পড়ে? সেই স্বামীর কাছ থেকে নয়নের আনন্দ স্নেহের উৎস অমূল্য রত্নকণিকা হৃদয়ের দুলালী সন্তান পেয়েছো;—দুনিয়ায় নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার মাতৃত্বের দান তুমি যার কাছ থেকে পেয়েছো তাকে ভালোবাস্‌বে না তো বাস্‌বে কাকে? কিন্তু তবু জানো—জান্‌তে সাধ যায়, এ বুভুক্ষু অভাগার জন্য একটু সহানুভূতিও তোমার আছে কি না। তুমি একদিন বলেছিলে, সে যেন স্বপ্ন যুগের কথা—মেয়ে-মানুষ নাকি একজনাকেই ভালোবাস্‌তে পারে,—আমরা পুরুষেরা নাকি তা পারি না,—সে কথাটা আমি ভুলি নি। অম্‌নি সব আরো কত কি কথার স্মৃতিই যে সময়ে সময়ে আমায় সর্ব্বস্বহারা পাগলের মতো করে তোলে। সেই ভীষণ মুহূর্ত্তগুলাতে বুকের রক্ত শিরায় শিরায় আঙ্গুলের ডগায় ডগায় কি রুদ্র তাণ্ডব জুড়ে দেয়! উঃ—এতদিনের প্রবল শাসনেও তো এ আপদ তাড়াতে পারলাম না। তুমি সুখে আছ কল্পনা করে কতকটা শান্তি পেলেও, যখন অনুভব করি যে, আমি তো সর্ব্বহারা হয়েছি তখন শুধু তোমার সুখের কল্পনাই আমাকে যে তৃপ্তি দিতে পারে না। তুমি বিশ্বাস করতে না পারো, কিন্তু সত্যি আমি নিজের সঙ্কীর্ণ-চিত্ততাকে অনেক চাবকেছি এই জন্য। তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসেন—তোমায় কে ভালো না বেসে পারে—তোমায় কত আদর সোহাগ করেন—সে চিন্তায় আমি ক্লিষ্ট হই না, তৃপ্তিই পাই—কারণ তুমি তো ভালোবাসবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছো; কিন্তু যখনি মনে করি তুমি তোমার ঐ শুভ্রনরম হাতদুখানিতে আর কারুর গলা জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা রেখে, চুম্বন লিপ্সায় উর্দ্ধমুখীন্ ফুলের মতো—ঠোঁটদুখানি তুলে ধরে, আধবোজা নয়নে চাইছ, তখন আমি আমাতে থাকি না। মনে হয় সে তোমার স্বামীই হোক যেই হোক সে পরস্বাপহারী, কারণ তোমার হৃদয় যে আমার কাছে অনেক আগেই বিকিয়ে গিয়েছিল। অথচ জানো,—আমি প্রীতিকে বাস্তবিকই ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি,—করি তার চরিত্রের জন্য, স্বভাবের জন্য, নিরীহতার জন্য—তার পত্নীবাৎসল্যের জন্য। কথাটা খুবই অদ্ভুত হয় তো তোমার কাছে ঠেক্‌ল—কিন্তু এ সত্যি, যদিও অদ্ভুত সত্যি—কেউ কেউ বলবে অস্বাভাবিক সত্যি। যাক্। আমার প্রশ্নের উত্তরে যদি স্পষ্ট বল আমায় বিন্দুমাত্রও আর স্নেহ কর না, করতে পারো না, তবুও আমি এক-তরফা পূজার একটা বন্দোবস্তই করে নিতাম। তুমি দেবীর মতো তোমার সুদূর আসনে বসে থাক্‌তে, আমি তোমার চরণে পুষ্পসম্ভার জুগিয়ে যেতাম। বস্তুতই আমার মনে হয় তুমি সংযমের তীতিক্ষায় ধৃতিতে আমা অপেক্ষা এত উচ্চে যে, বাস্তবিকই আমার পূজা পাবার যোগ্য। সেই মনে করেই সে দিন ট্রেনে বিদায় নেওয়ার সময় ছড়িয়ে দেওয়া পয়সা কুড়োবার ভাণে তোমার একখানি চরণে আমার ব্যাকুল ওষ্ঠ ছুঁইয়ে ছিলাম। তুমি হয় তো তা বোঝো নি, হঠাৎ তোমার পায়ে আমার গা লেগেছে বলে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়েছিলে কিন্তু আমার আশা ও ষ্টেশনে আসা সার্থক হয়েছিল। ... তুমি বল্‌তে পার তোমার কোনো কথা না শুনেও তো এ আত্মনিবেদন চলতে পারে। কিন্তু কথাটা জান্‌তে যে বড্ড প্রাণ চায়! আর তুমি তো জানো, ছেলেবেলা থেকে আমি যা চাই তা পেতে কি রকম ক্ষেপে যাই! তোমায় হারাবার অনতিপূর্ব্বে ভাবতাম, এটুকু সইতে পারবো না?—আমায় ভারী শান্ত সমাহিত দেখেছিলে—কিন্তু তারপর তোমায় হারিয়ে কেন যে দেশ ছেড়েছি তা অন্তর্য্যামী যদি কেউ থাকেন তিনিই জানেন। এ দুঃসহ

পোড়ানির কথা আগে কল্পনায় এলে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে আমি যে দিকে চক্ষু যায় বেরিয়ে যেতাম, আমি জানি তুমি আমার কথা তখন ফেলতে পারতে না।

দ্বিতীয় কথা—তোমাকে আমি কী বিশ্বাস করি তা কি এবার এক মাসের সাক্ষাতে টের পাও নি? তার প্রতিদানে তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করে তোমার অন্তরের সত্য ভাবটুকু ধরা দেবে না? সত্য গোপন করাই কি তোমার কর্ত্তব্য মনে কর,—আর সত্য ব্যক্ত হয়ে পড়লেই যত অপরাধের বোঝা তোমায় ঘিরবে? তোমার চোখের চাউনি যা বল্‌ত তা আমি কি তবে ভুল ঠাউরেছিলাম? তুমি এ ক' দিনে এতই বদলালে যে, তোমার চোখের ভাষা আমায় এত সহজে প্রতারণা করে? অথচ সে দিন কি শক্ত শক্ত বিষমাখা কথাগুলাই বল্লে। তোমার এই লুকোচুরিই তো আমায় সেদিন রাগে পশুত্বে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তোমায় যেদিন কাপুরুষের মতো ধরে ব্যথা দিই সে দিন সেই ঘৃণ্য মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসার আমার চোখের সামনে নৃত্য করছিল এই কথা ভেবে যে, তুমি তো সমস্ত মায়া-দয়ার হাত থেকে ছুটি নিয়েছো, এবং কাজেই নেহাত আমার পাগলামোটাকে উপভোগ করবার খেয়ালেই ঐ চাউনির জাল ছড়িয়ে আমার বুকের কথা সব টেনে বার করে নিলে। আচ্ছা, তুমিই বলো এতে মানুষ ক্ষেপতে পারে কি না। তুমি তার বুঝবে কি? চারদিক হতে মাতা-পিতা ভাই-ভগিনী স্বামীর অজস্র ভালোবাসা যার উপর শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়ছে, সে কি বুঝবে ভালবাসা না-পাওয়ার মূল্য কি?—আর একটিবার মাত্র তা পেয়ে আবার সেই ভালোবাসা দিয়ে অপমানিত হবারই বা জালা কি? ... ওগো পাষাণী, একবার বলবে না কি তবু—ঐ চোখের কথাই ঠিক—না, ঐ মুখের কথাই ঠিক—যার বিষের জ্বালায় বছর ধরে খাক হয়েছি! ঠিক বোলো আমি মনে ব্যথা পাবো মনে করে চক্ষুলজ্জা করো না। যা সইছি এর চাইতে তুমি আর কি ব্যথা দেবে?

তৃতীয় কথা।—আমি দিন দিন মনুষ্যত্ব খোয়াচ্ছি। যেটুকু তার অবশিষ্ট আছে, সেইটুকু বজায় রাখতে তুমি অনেকটা সাহায্য করতে পারো,—তা নইলে "দেবদাসের" মতো ঘূর্ণিপাকে গা ঢেলে দিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার পথ আমার সুপরিষ্কার হয়ে আসছে। তোমার সঙ্গে যেন আড়ি দিয়েই, দেহ ও মনটাকে ঘৃণ্যভাবে নষ্ট করে তোলবার একটা উৎকট আকাঙ্খা এই বছরটা ধরে মনে মনে এক একবার উন্মত্ত আলোড়ন দিয়ে উঠেছে,—যেন তুমি বুঝতে পারো, তোমার একটি মাত্র কথায় কি হতে পারতো;—আর এই অভাগার ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা কি চমৎকার,—সেই একটি মাত্র কথা না বলায় কি হয়েছে। তুমি বোধ হয় জানতে, মনুষ্যত্ব আমার মধ্যে কোনোদিন একটু-আধটু ছিল, কিন্তু তোমারই যূপকাষ্ঠে সব বলি দিয়ে তোমায় বুঝিয়ে দেবো,—"এ জীবনে মম সর্ব্বাধিক পাপ মোর ওগো সর্ব্বোত্তমা করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।" এ মানসিক অবস্থাটা ভারী অদ্ভুত, ভারী লোভেরও বটে। এ আমায় এম্‌নি টানছে,—ঠিক আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, মাকড়শা কাঁচপোকাকে জালে টেনে গুটিয়ে নেয়। একটা মানুষকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করাও কি মানুষমাত্রেরই একটা কর্ত্তব্য নয়? তাই মনে করেও কি এ কথাগুলির জবাব দেবে না?

আর একটা কথা জেনো,—যতদিন না আমি সঠিক জানছি, তোমার মনের ঘৃণা, লজ্জা, অভিমান, ভালোবাসা, বিরক্তির কোন্ কোঠায় আমায় স্থান দিয়েছো, ততদিন তুমিও মুক্তি পাবে না। কারণ আমি মুক্তি দেবো না, দিতে পারবো না। আমি আমার প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে কিরূপ অক্ষম, তার পরিচয় পেয়েছো,—সেই স্বভাবই আমায় স্থির থাকতে দেবে না। এই অসহ বিরক্তি থেকে অব্যাহতি পেতে হলেও তোমায় আমাকে একটা শেষ জবাব দিতে হবে।

এমন বেহায়াপনা করে চিঠি তোমায় কোনোদিন লিখি নি। তুমি রাগ হবে, বিরক্ত হবে, হয় তো ঘৃণা করবে,—কিন্তু যা-হোক একটা কিছু তো করবে,—তাই আমার লাভ। যাই কর, বুক নিংড়ে কোরো। কিছু-না-করার চাইতে প্রাণপণে ঘৃণা কর তাও ভালো। কিন্তু তোমার ঐ নিথরপ্রস্তরমূর্ত্তির মতো দুঃসহ নীরবতা থেকে আমায় রেহাই দাও। একটা কথা আরো বলছি,—যদিও তা

বলবার দরকার ছিল না—তোমার দিক থেকে তো দরকার ছিল না মোটেই, কিন্তু আমার দিক থেকে আছে বৈকি কিছুটা। লাভলোকসান খতিয়ে দেখতে গেলে দুনিয়ার অনেক জিনিষেরই অর্থ থাকে না; যেমন ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে লাভ কি, হাওয়ার শীতলস্পর্শ বয়ে লাভ কি, পাখীর গেয়ে লাভ কি? তেমনি আমি যে তোমায় কি ভালোবাসি তা ব'লে লাভ কি? গন্ধ ছড়ান ফুলের, বয়ে যাওয়াই হাওয়ার, গান গাওয়াও যেমন পাখীর চিরন্তন প্রকৃতি, তেম্‌নি তোমাকে ভালোবাসাটা আমার একটা স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। দুষ্কার্য্যের জন্য মায়ের বকুনি খেয়েও শিশু যেমন মা'র কাছেই অশ্রুজলের সমাপ্তি করতে তাঁর গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকোয়, তেমনি আমাকে বুঝি তোমার ভালোবাসতেই হবে, এর একটা অমার্জ্জনীয় প্রয়োজনীয়তা আছে, যা আমার প্রাণে প্রাণেই মাত্র আমি দিবানিশি অনুভব করি। আমাকে এইটুকু অধিকার দিও, শুধু এইটুকু। সংসারে আমায় অনেকেই পাগল ব'লে বলে, তুমি একে পাগলেরই উন্মত্ততাবোধে মার্জ্জনা করে যেয়ো আর কুণ্ঠিত বা অপমানিত বোধ করো না।... তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি,—এ কথা বলতেও কি এত মিষ্টি!...

তোমার ভালোবাসা, তার দেনা-পাওনা যদি বা আমার অদৃষ্টে চুকেবুকে গিয়েই থাকে, তবু যে "পরতে গেলে লাগে, এয়ে ছিঁড়তে গেলে বাজে!"—দীর্ঘ ছয় বৎসরে আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা ছিল, বিশ্বাস ছিল যে, দু' একদিন এ অভাগার কথা মনে করে এখনো তোমার দু' একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চিরকাল পড়বে। তুমিও কী ভালো আমায় বাস্‌তে তা' তো আমি ভুলি নি।... মাঝে মাঝে আমি কামনা করতাম, তোমার একটি শিশু হোক, শুধু দেখবার জন্য যে, তাকে দিয়ে পরে আমাদের কতটুকু কি অবশিষ্ট থাকে। করুণাটুকুও তখন করতে হয় তো তুমি দ্বিধা বোধ করবে, কারণ মাতৃত্বের গৌরবে সমাসীন হয়ে সামাজিক ও সাধারণ সংস্কারবশে তোমার ও আমার পূর্ব্ব-সম্পর্কটার স্মৃতি হয় তো তোমার চক্ষে নিতান্ত হেয় ঠেক্‌বে। মাতৃত্বের সম্মান-রক্ষার জন্য আত্ম-মর্য্যাদার একটা প্রচণ্ড গণ্ডী টেনে প্রাগ-জীবনের এ পরিচ্ছেদটা একটা বিষম অপরাধ বলে মনে করবে;—তাই হয় নি কি? তবুও সুনীতি, এ কঠোর দুরদৃষ্টের বাড়বাগ্নি যদি এমন করে এর সর্ব্বনাশী শিখা না ছড়াতো তবে আমরা দুজনায় কি স্বর্গই যে সৃজন করতাম, তা মনে করে একটিবারও কি তোমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে?

তোমার সেই হীরার-আলো-ঠিকরে-পড়া মুখে—থাক্, আর কেন?—সেই মুখখানি তোমার কালি হয়ে গিয়েছে, হাসির ছোপটুকু নেই, চঞ্চলতার মাধুর্য্যটুকুও নেই,—আমি ভাবি কেন এমন হোলো?—ভাবি আমার দায়িত্ব এতে কতটুকু। যদি একটুও দায়িত্ব থাকে তারি কল্পনায় বুকের মধ্যে দুষ্ট আনন্দ ও অকৃত্রিম বেদনায় যুগপৎ মত্তকলরোল তোলে। কিন্তু দুষ্ট আনন্দ মুহূর্ত্তমাত্র থাকে, তারপর পুঞ্জীভূত বেদনা গুমরে মরে। যাকে সব চাইতে ভালো-বাসি তার অসুখের কারণ হওয়াটা কতবড় দুঃখের তা হয় তো তুমি জানো না। সেদিন মামী-মা বলছিলেন, "সুনীতির সে ঠোঁটে-লেগে-থাকা হাসিটুকু আর নেই"—তখন একশো চাবুকের ঘা একসঙ্গে কে যেন আমার কলিজার উপরে সপাং করে কষে দিয়েছিল তার সন্ধান জানো কি?

বল—বল সুনীতি, কেন তোমার মুখখানিকে দুষ্ট ম্লানিমা দিনরাত ছেয়ে থাকে,—শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত ছাড়া,—যখন তোমার শিশুটি তোমার মাতৃত্বের রস নিংড়ে বার করতে থাকে আধ-ভাষায়, আধ-হাসিতে, আধ-কান্নায়! আহা এই জন্য আমি ওকে কত যে ভালোবাসি! তোমার রক্ত-মাংসে তৈরী এই পুত্তলিকা তোমার কোল জুড়ে বেঁচে থাক, তোমার প্রাণ অবিচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দে ছেয়ে রাখুক।

ভালোবাসায় নির্ব্বাক্‌ ত্যাগের সাধনা বড় সোজা নয়,—আমিও মনটাকে এখনও অতটা শান্ত সমাহিত করে উঠ্‌তে পারি নি। কিন্তু ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা নির্ভর করছে তোমার জবাব দেওয়া না-দেওয়ার উপরে। যদি শান্ত হতে পারি আর একদিন তোমায় দেখতে আসব—যদি বেঁচে থাকি।

আমি এতদিন বাঁকীপুরে ছিলাম। দিল্লীর যে ঠিকানা চিঠির ওপরে দিয়েছি সেখানে চলেছি।—চলেছি একটা কাজ নিয়ে। দু'পাঁচ টাকা হাতে হলে আবার কিছুদিন ধূমকেতুর মতো ঘুরে বেড়াব। চিঠিখানার উত্তর যদি না দাও তবে—না না, তোমায় ভয় দেখানোও বৃথা, অভিমান করাও বৃথা, তা' তো জানছিই—কিন্তু ... কিন্তু, উত্তর দিও। ইতি—

হতভাগ্য—অরুণ

অরুণের চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ফের প্রীতিনাথ স্ত্রীর পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

...চিঠি পড়লে? আমি চিঠিখানা পড়ে প্রথম ভাবলাম, জবাব দেবো না,—কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অরুণের একই কথা এতবার করে বলবার অস্থির ব্যাকুলতা, তার ব্যথা-কাতর অশ্রুসজল চক্ষুদুটি আমার মনশ্চক্ষের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল। পরে ভাবলাম, সত্যিই এ লুকোচুরির কি প্রয়োজন?—অরুণকেও প্রতারণা করবার কি দরকার? তোমাকে প্রবঞ্চনা করে তো দিনের পর দিন কাটাচ্ছিই, অরুণকে সত্যকথা বল্লে সে যদি মনে একটু শান্তি পায় তো আমি তাতে বাদী হই কেন? অতি সুদীর্ঘ বিচ্ছেদেও যে অরুণ আমাকে কোনোদিন ভুলে যেতে পারে এ ভরসা তখন আমার আর ছিল না,—তাই তাকে একখানা চিঠি দি,—তার নকলখানা এই দিনটির জন্য আমি যত্নে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি দেখো।

সুনীতির অরুকে লেখা চিঠি,—

তোমায় কি লিখব ভেবে পাচ্ছি না, লিখবার কিছু দরকার ছিল কি? যতই লুকোই, তোমার কাছে যে আমায় ধরা পড়তেই হবে। তুমি চিরকালের সেই ক্ষ্যাপাটিই আছ বলে রাগের মাথায় যা-তা সব ভাবো, লেখো, অথচ তুমি বুক হাতড়ে দেখো, তুমি সব বুঝেছো—আমি তোমায় এখনো কি চোখে দেখি! তোমার পাগলামো আমি উপভোগ করতে চাই,—হারে অদৃষ্ট, তুমি কি আমার খেলার বস্তু? বলেছো আমার সব আছে;—মা আছেন, বাবা আছেন, স্বামী, কন্যা, ভাই, বোন—সব আছে—আর তোমার কেউ নেই? কেন,—যদিও বাবা-মা স্বর্গে গেছেন, দেবতার মতো সহোদর জ্যেষ্ঠভাই, বোনেরা, কাকা-কাকীমা, তাঁদের ছেলেপিলেরা—এরা সব রয়েছেন। তাঁরা তোমাকে খুবই ভালোবাসেন,—এর চেয়ে তুমি আর কি আশা করতে পার? তুমিই না পরের মতো তাঁদের কাছে ঘেঁসো না। ছিঃ, মানুষ হও। তোমার ভিতরে কি শক্তি নিহিত আছে আমি জানি,—সে শক্তি বৃথা অপচয় কোরো না। আমি তোমায় উঁচু হতে দেখলে এত বড় দুঃখেও বড় সুখ পাবো,—কিন্তু তোমার মলিন মুখে কক্ষচ্যুতগ্রহের মতো একা একা ঘুরে বেড়ান আমার সহ্য হয় না। তুমি ঘরের ছেলে হয়ে পরের মতো যদি থাক তবে আত্মীয়স্বজনের কি কষ্ট যে হয় তা কি ভেবে দেখো না!

তোমার কাছে আমার চক্ষুলজ্জা নাই। সুদীর্ঘ অদর্শনে, কঠোর ব্যবহারে, আমি ধীরে ধীরে তোমার কথা ভুলে যাব এ আশা আমার ছিল, তাই নিজের বুকের এ-পিঠ ও-পিঠ ছুরি চালিয়েও তোমাকে কটু বলেছি, সে জন্য মাপ করো।

আমার কথা ভেবে তুমি দুঃখ করো না। তুমি আমার চিন্তা ছাড়, মনে কোরো আমি মরে গিয়েছি। ছি, ছি দেবী বলে আমায় আর লজ্জা দিও না,—এই দেহটা পরের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছি এ কথা যখন ভাবি তখন মেয়েটার দিকেও চাইতে নিজের প্রতি ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে ওঠে, নিজেকে সান্ত্বনা দি,—ওদের আমি আর কারুর কাছ থেকে পাই নি,—ভগবানের দয়ার দান রূপেই পেয়েছি। এ জীবনটা ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়াবার জন্যই বোধ হয় ভগবান ঐ একরত্তি মেয়েটাকে আমার কাছে রেখেছেন,—ছেলেটাকে তো কোলেই টেনে নিলেন, নইলে আমার আর কি আছে? আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, এ ব্যর্থতার কাঁটা গোলাপ হয়ে যেন আমার বাছার জীবনে ফুটে ওঠে।

কুমারী জীবনের সমগ্র ভালোবাসা তোমার মধ্যে যে-দেবতার পায়ে আমি উৎসর্গ করেছিলাম, তোমার সে দেবত্বে আমার বিশ্বাস আছে। হৃদয়ের সিংহাসনে সগৌরবে বসিয়ে যাকে আশৈশব পূজা দিয়েছি ও দিচ্ছি, সে দেবতাকে তুমি ধুলোয় লুটোতে দিও না। এ জন্মে সেবা থেকে বঞ্চিত রইলাম পরজন্মে যেন সেবার সুযোগ ভগবান দেন।

যাক্—যদিও ভগবানে বিশ্বাস যেন দিন দিন হারাচ্ছি, তবু এ বল্‌তে ভালো লাগে,—ভগবান তোমায় শান্তি দিন। ইতি—

প্রণতা সুনীতি

এই চিঠি দেবার পর অরুণের সঙ্গে আর আমার পত্র-ব্যবহার হয় নি। কিছুদিন পরে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, অরুণ ফ্রান্সে যাচ্ছে যুদ্ধে,—গতবছর সে সেখানে মারা গেছে, তাও কাগজে দেখেছি।... আজ মৃত্যুদূতের পরোয়ানা পেয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছে,—ইহলোকের পরপারে গিয়ে অরুণকে পাবো কি? সে কি আমায় তেম্‌নি ভালোবাসবে, আমিও কি তাকে তেম্‌নি ভালো-বাসব?—ভালোবাসার, অসহ্য পুলক কি জীবনের ঐ পারেও থাকে,—সেখানেও কি সমাজের বেড়া আছে, অদৃষ্টের শাসন আছে? সেখানেও কি মনের সঙ্গে মুখের এম্‌নি লুকোচুরি চলে? ... আরো ভাবছি তা যদি না চলে তবে তোমার এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে, তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা গিয়ে কি দাঁড়াবে? ... ছাখো, তুমি আবার বিয়ে কোরো,—ওখান থেকে যদি পৃথিবীর ব্যাপার দেখে খুসী হওয়া যায় তো দেখে আমি খুব খুসী হব। তুমি কি বিশ্বাস করবে তোমার কথা কল্পনা করে আমার চিরকাল দুঃখ হয়েছে? আজ তোমায় মুক্তি দিতে পারছি বলে সত্যি আমার আনন্দ হচ্ছে। ... আর লিখতে পারছি না;—যাক্, আমার কাজও শেষ হয়েছে। ... তুমি আমার বিদায়ের প্রণাম নিও। শ্রীলেখাকে ভালোবেসো। ইতি—

সেবিকা সুনীতি

* * *

প্রীতিনাথ পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া চিঠিখানি পোড়াইয়া ফেলিলেন।

একটু পরে সন্তনিদ্রোত্থিত শ্রীলেখা দৌড়াইয়া আসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ঠাকু-মা কাঁদছে কেন বাবা? মা তো তার ঘরে শু'য়ে নেই। ঠাকু-মা বল্লেন, মা স্বর্গে গেছেন। স্বর্গ কোথায় বাবা?"

অঝোরে প্রীতিনাথের দুই চোখ হইতে কপোল বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দুই হাতে কন্যাকে বক্ষে টানিয়া তিনি বলিলেন, "স্বর্গ কোথায় জানি নে মা;—তবে যদি কোথাও থাকে, তবে তোমার মা স্বর্গেই গিয়েছেন।"

বাস্তু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গ্রামস্থ জমীদার
শুভবৈশাখে দিল মোরে নবগৃহনির্ম্মাণ-ভার।
সে গৃহের ভিত-পত্তন সেরে দুপ'রে ফিরিতে ঘরে,
সনাতন সা'র ভিটায় দেখি যে একজোড়া ঘুঘু চরে।
ঊর্দ্ধে সূর্য্য রুখিয়াছে রথ পতন-পথের বাঁকে,
রুদ্রতুরগ রশ্মি মানে না রৌদ্রকেশর ঝাঁকে।
কচি পল্লব ছায়া বুলাইছে বুড়ো অশথের গায়,
'ফটিক জল'-এর বুদ্বুদ্ উঠে নিদাঘের কিনারায়।
সন্তর্পণে আসিয়া তখন ভিটের সন্নিকটে
শ্যাওড়া ঝোপের আড় হ'তে দেখি,—বাস্তুঘুঘুই বটে!

মুখোমুখি বসে' ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে বাস্তুঘুঘুর জোড়,
গলা ফুলাইয়ে ঘাড় দুলাইয়ে প্রেমসঙ্গীতে ভোর।
ছুটে ছুটে যায়, কুড়াইয়ে পায় কত না কিসের কণা,
এ-ওরে দেখায়, মুখে গুঁজে ছায় কি সোহাগে দুইজনা!
কখনো ঘুঘুর ঠোঁটে
কোন উৎসব-রজনীর 'কনে-চন্নন'-কণা ওঠে।
ঘুঘুনি ছুটিয়া আসি,
ভাঙা শাঁখা খুঁটে সিঁথেয় সিঁদুর ঘুঘুরে দেখায় হাসি।
জমাট রক্ত, শুকনো অশ্রু, পাণ্ডুহাসির গুঁড়ো,
বুকের ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ভানা সুখের দুখের কুঁড়ো;—
সনাতন সা'র পোড়ো ভিটে হ'তে আহরি সে সব সুধা,
প্রেমবিহ্বল ঘুঘু-দম্পতি, দেখিনু, মিটায় ক্ষুধা।
বাস্তুর প্রেম-গানে
দিন-দুপ'রের দিক্-দিগন্ত কেঁদে উঠে মুলতানে।

ভিটেয় ভিটেয় ব'সে আছে দেখি বাস্তুঘুঘুর জোড়,
প্রেমের নেশায় রক্তিম আঁখি, ক্ষণিকের সুখ-খোর !
বিশপুরুষের বিস্মৃতিতলে কাঁদে লাখো হাহারব,
তাহারি উপর সোহাগ-কূজন, দুজনের উৎসব !
সে মরণ-স্তূপে করি আহরণ জীবনের ছিটেফোঁটা,
মিলন-পরশ-রস-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে হয় মোটা।
মুগ্ধ বুকের ক্ষুদ্র সুখের ভিটায়ন-প্রেম-গানে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্রকালের অধরে হাস্য আনে!
সে যে বেশ জানে ভাই ;—
ভিত-পত্তন ভিটে-পত্তনে কিছুই প্রভেদ নাই।

সাহিত্যিক-সংহতি

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

আমরা কয়েকজন গ্রন্থকার মিলিয়া যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিলাম, ক্রমশ তার প্রাণশক্তি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সে দেহে নূতন জীবন-সঞ্চারকল্পে কি উপায় আবশ্যক এ সম্বন্ধে সভ্যগণ মাঝে মাঝে নিজ মত ব্যক্ত করিতেন ; একদিন এইরূপ একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াও গেল। প্রস্তাবটি এই, প্রতি সপ্তাহে কোনো একজন সভ্য সংহতি-গৃহে তাঁর জীবনের একটি সত্য কাহিনী বলিবেন ; মানবধর্ম্মের সহস্র বিভিন্ন রূপের একটির প্রতিরূপ কাহিনীটিতে থাকা আবশ্যক, ঘটনাবাহুল্য অপেক্ষা অনুভূতির বৈচিত্র্য, এবং কর্ম্মচাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে গভীর মনোভাবের লীলা প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

সেদিন সুহাস তাঁর কথা বলিতেছিলেন ; ইনি এ সংসদের নূতন সভ্য ; সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য আগত হইলেও তাঁর লেখার অন্তস্থলে এমন এক প্রাণময় মানুষের সন্ধান পাওয়া যাইত যে, সংহতির সম্পাদক-সঙ্ঘ সাগ্রহে তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে লইয়াছিলেন।

ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত মনে মৌন থাকিয়া সুহাস বলিলেন, আমার জীবনের সঙ্গে এ কাহিনী এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, যাতে এর বিবৃতির অর্থ—নিজেকে প্রকাশ ; এ কার্য্য মুখের কথায় হয় না, কারণ নিজেকে স্পষ্টত দেখতে শিখেছি এরূপ বিশ্বাস অদ্যাবধি আমার আসে নি। সে জন্য আমি নিজের ego-কে সাধ্যমত আবৃত রেখে শুধু

কয়েকটি ঘটনার ভিতর দিয়ে যতটুকু বলা যায়, তাই বলব। এতে আমার মনের অনেকখানি অংশ আপনাদের অগোচর থেকে যাবে, কিন্তু যতটুকু গোচরে আসবে, তার ভিতর অসত্য কিছু থাকবে না।

(১)

বছর দুই পূর্ব্বের কথা। আমি তখন বেহারের কোনো সহরে বাস করছিলাম। সঙ্গে মামাত বোন মীরা। ও সহরের আকার প্রকার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ কৌতূহল তাকে সেস্থানে নিয়ে এসেছিল।

ভালই কাটছিল। বাড়ীর কিছু দূরে গঙ্গা। বর্ষান্তেও তার গৈরিক রূপ অপরূপ লাভ করে নি, এবং তার স্রোতের চাঞ্চল্য অব্যাহতই ছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে উৎসাহ সহকারে মীরা বল্লে, জানো সুহাস-দা, কাকে দেখেছি আজ? আমাদের লীলা—লীলা বোস্।

—তোমার লীলাকে চিনি বলে তো বোধ হচ্ছে না।

—আচ্ছা বেশ, দুদিনে চিনে নেবে। লীলা তোমাকে খুব জানে, বুঝলে তো, তোমার বইগুলো প'ড়ে। ডায়ো-সিসানে আমার ওপর ক্লাসে পড়ত, আই-এ দিয়ে চলে গেল। কাল আচমকা দেখা, বল্লে, নতুন এসেছি—মামার বাড়ী থাকবো কিছুদিন।

—তা থাকুন; তোমার বন্ধুকে জানতে বিশেষ কিছু তো আগ্রহ হচ্ছে না।

স্মিতহাস্যে উত্তর করল, তোমার না হতে পারে, ও বলেছে কালকেই এসে দেখা করে যাবে। তোমার ওকে খুব ভাল লাগবে দেখো; ওর এমন সব অদ্ভুত আইডিয়া—আমার সঙ্গে তার কিছু মেলে না। ওকে দিয়ে হয় তো একটা গল্পও লিখে ফেলতে পারো!

পরদিন পরিচয়ান্তে লীলা বল্লে, আপনার নতুন উপন্যাসটা পড়ছিলুম।

—বেশ কথা, সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছিল।

দৃষ্টির বিস্ময় দেখে বুঝলুম, আশা করেছিল কেমন হয়েছে প্রশ্ন করব।

ক্ষণকাল মৌন থেকে হঠাৎ বলে উঠল, আপনার উপন্যাসে নারীচরিত্র থাকে না কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন! থাকে না বুঝি?

—যা আছে সে সব তো ছোট ছোট মেয়ে; নিতান্তই শিশু, অপরিণত।

তা হবে! মৃদুহাস্যে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে নিলুম।

এবার তার মুখে ঈষৎ বিরক্তির রেখা দেখা গেল। মীরার দিকে ফিরে বসে তার সঙ্গে গল্প সুরু করে দিল, আমার উপস্থিতি যেন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে।

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম; বালির উপর উপবিষ্টা পাঠনিরতা একটি মেয়েকে দেখে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, লীলা! খোলা চুল বাতাসে উড়ে মুখে পিঠে ছড়িয়ে পড়ছে; একমনে পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কাছে যেতে মুখ না তুলেই বল্লে, বসুন না। অলস হাস্যে ঈষৎ মাথা নেড়ে পার্শ্বস্থ স্থানটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল। তারপর চুলের একটা কাঁটা খুলে বইয়ের পাতায় নির্দ্দেশার্থে রেখে বইখানি মুড়ে ফিরে চাইল।

— কি বই পড়ছিলেন, দেখি?

—সাইকলজি। হ্যাভ্‌লক্ এলিসের বই। নারীর মনস্তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—'Modesty' ইত্যাদি কত কি। কেমন ধৃষ্টতা দেখুন তো।

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বল্লে, এঁরা বৈজ্ঞানিক ভাবে, অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে মেয়েদের বুঝতে চাচ্ছেন। হাসির কথা নয়? আর না বুঝেও শুধু কতকগুলো মালমশলার উপর নির্ভর করে পরম বিজ্ঞের মত জানিয়ে দেন—বুঝি। এই দেখুন না, এঁদের মতন যাঁরা নিজেদের মনস্তত্ত্বজ্ঞ বলে থাকেন, তাছাড়া ছোট-বড় গল্প-উপন্যাস লেখক সবাই মনে করেন, নারীর মন এঁদের কাছে ঠিক যেন সরল রেখার মতন!

—অনেকে হয় তো সত্যই বোঝেন।

—ও! আপনিও বুঝি তাঁদের একজন?

হাস্যচঞ্চল চক্ষু দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বল্লুম, মনের একাংশ ছুঁতে পারলেই সমগ্র মনটি ধরা যায় না, এ কথা আমি জানি—কিন্তু যেটুকু ছুঁতে পারা যায় তার বিশ্লেষণ যে নিতান্তই অসঙ্গত তাও তো মনে হয় না।

আমার কথায় সে খিলখিল করে হেসে উঠল; তারপর সহসা নিতান্তই যেন ছেলেমানুষের মত অসম্বদ্ধ ভাবে বল্লে, আমি এমনি জায়গায় গান গাইতে ভা—রি ভালবাসি। আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

—আপনার গান শুনতে আমার সত্যিই খুব লোভ হচ্ছে।

'জগতের মাঝে ঘৃণ্য হয়েছি
তুমি শুধু ঘৃণা কোরো না—'

অস্ফুট কলধ্বনি নদীর কল্লোলের সহিত মিশে মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল। ওষ্ঠে সবিদ্রূপ হাস্যরেখা; সুগঠিত মস্তকের ছন্দজ্ঞাপক মৃদু সঞ্চালনে সন্ধ্যার আলোয় মুখখানির ছবি অপূর্ব্ব-সুন্দর।

—ঐ যে মীরা আসছে। গানের মাঝখানে এ কথা বলে সুর আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে এল।

মীরাকে বিস্ময়াপন্ন দেখে দুই বাহু ধ'রে সজোরে কাছে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিল।

—বাঃ কি চমৎকার! দেখ্ ভাই, কেমন একটা সাদা পালতোলা নৌকো চলেছে। সহসা গান থামিয়ে একদৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে রইল। তারপর গাঢ়স্বরে বল্লে, বর্ষাকালে জল যখন ফুলে ওঠে, নৌকোয় ঘুরতে কি মজা!

আমার দিকে ফিরে বল্লে, এখানে মেয়েদের স্কুল দেখেছেন? তার থেকেই আমি ম্যাট্রিক দিই। কি দুষ্টু ছিলুম আমরা ক'জন! একবারের কথা বলি;—ঠিক করা গেল, রাত দুপুরে গঙ্গায় নাওয়া যাবে। গঙ্গার ধারেই বোর্ডিং কিনা, আর তখন গ্রীষ্মকাল। মিস ঘোষের যা মেজাজ ছিল, ধরতে পারলে আমাদের বোর্ডিং-বাস ঘুচিয়ে দিতেন। আমরা তখন এক বুদ্ধি করলুম, প্ল্যান্ আমারই তা বোধ হয় বুঝছেন! বালিসগুলোকে এমনভাবে সাড়ি দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখা গেল যেন আমরাই ঘুমিয়ে আছি। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে ঝুপ্ ঝাপ্ জলে নেমে পড়লুম আমরা পাঁচজন মেয়ে। চাঁদনি রাত্—একঘণ্টা পরে চুপিচুপি ফেরা গেল। পরদিন এক জনের জ্বর, দুজনের গলা ব্যথা, শুধু আমার আর মীরার কিছু হয় নি।... না, সব চেয়ে মজা আরব দেশের মেয়ে হতে; এমন বন্দী হয়ে থাকতে হয় না, কালো ঘোড়ার পিঠে হু হু করে বাতাসের আগে ছুটে চল্—।

ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনার মত সে কত কি ভাবতে লাগল।

বাড়ী ফিরতে মীরা প্রশ্ন করল, এবার বল আমার বন্ধুকে কেমন লাগছে!

—নিজের সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন; কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ ভাবটা না কাটালে সুখী হতে পারবে না।

—কি মেয়ে বাবা, সারাক্ষণ তোমার দিকে stare করে ছিল!

—তা জানি; সে তো তোমাদের স্বভাব। ও বস্তুটী হচ্ছে মাকড়শার জালের মতন!

—যাও, কি দুষ্টু! নিজেরা যেন পরমসাধু পুরুষ!

(২)

অতঃপর প্রায় প্রত্যহ তার সঙ্গে দেখা হয়। বিশেষত সামান্য এবং অত্যন্ত অগভীর কথাই সে আমার সঙ্গে বলত। কোনো গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করলে এমন ভাব দেখাত যেন সাধারণ বাক্যালাপে সেরূপ কথা বলার মত হাস্যকর বস্তু আর দ্বিতীয় নেই। একবার সেই পূর্ব্বের কথা—নারীর মনস্তত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম; উত্তরে সে পরম উৎসাহে আমেরিকান্ মোটরের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এ বিষয়ে নিজের গবেষণা জানিয়ে দিলে। কিন্তু বোধ হল যেন সহসা ওর দুই চক্ষু অলক্ষিতে মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠে পরক্ষণে আবার পূর্ব্বের সেই শান্ত, অচঞ্চল ভাব ধারণ করল।

বল্লে, আপনি আমার নাম ধরে ডাকেন না কেন? 'মিস বোস্' হতে আমার একটুও ভাল লাগে না। ... না, আর কোনো কথা নয়, ঠিক হল আমার নাম ধরে ডাকবেন, আর 'আপনি' ছেড়ে তুমি বলবেন। না বললে আড়ি; তবে যদি লীলা নামটা অপছন্দ হয়, অন্য কোনো নাম দিতে পারেন—আপনার উপন্যাস থেকে বেছে! আমার আপত্তি নেই।

ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল, লীলা আমার প্রতি দিনে দিনে বিশেষ আকৃষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখলে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাড়ী ফিরবার পথে ম্লানায়মান দেখায়! মাঝে মাঝে আচম্বিতে মুখ তুলে দেখেছি, সে তার কালো চোখ গভীর রহস্যময় দৃষ্টিতে আমার প্রতি নিবদ্ধ করে আছে। গালে ঈষৎ রক্তিম আভা, ঠোঁটছুটি পরস্পরে দৃঢ়সম্বদ্ধ, আঙুলগুলি চঞ্চলভাবে সঞ্চালিত। এই চিন্তা অত্যন্ত দ্রুত আমার মনে বিস্তার লাভ করতে লাগল। কিন্তু প্রথম যেদিন বুঝলুম, লীলার জন্য আমার দেহমনের প্রতি কণাটি কতদূর উন্মুখ হয়ে আছে, অদম্য চিত্তবৃত্তির বাহিরের আত্মপ্রকাশ আশঙ্কায় শুধু তখন নিজের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি নি, প্রচণ্ড ঘৃণাভরে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়েছিলাম। অবশ্য আমি জানতুম, কোনো সুন্দরী মেয়ে ভালবাসে জানলে এমন পুরুষ নেই যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও আনন্দবোধ না করে থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণের এ মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখা আমার কাছে নিতান্ত অপ্রীতিকর ছিল; তার কারণ, লীলা শুধু আমার অহমিকা বস্তুটিকে স্ফীত করে ক্ষান্ত হয় নি, ভিতরের মানুষকেও দুঃসহ আকর্ষণে তার একান্ত সন্নিকটে নিয়ে এসেছিল। আর লীলার অনুভূতির মূল কোথায়, সে ভিত্তিতলে কেমন গভীরত্ব', স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতি মোহ কোন্ বস্তু তার কতখানি গঠন করেছে, সে সম্বন্ধে তখনো আমি কিছুই বুঝি নি, তাই ভাবতুম, হয় তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো গভীরতর অনুভূতির ঝড়ের মুখে তৃণ-খণ্ডের মত তাকে চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ... আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বের আর অন্ত ছিল না।

একদিন সকালে এই কথাগুলিই ভাবছিলাম, সহসা তাকে নিঃশব্দে দুয়ার খুলে ঘরে ঢুকতে দেখে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে বলে উঠলুম, লীলা? কখন এলে?

—মীরার কাছে শুনলুম আপনার শরীর ভাল নেই, কি হয়েছে বলুন দেখি?

—তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু জর।

—কাল রাতে আপনার কথা কেবল মনে পড়ছিল; বিকেলে দেখা হল না, বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলেন।

—একদিন দেখা না হলে এত কিসের ভাবনা?

গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে বল্লে, ওমা, এত লেখেন আপনি, আর এটুকু বোঝবার মত কল্পনা নেই! রোজ রোজ দেখা হয়, হঠাৎ একদিন না হলে ভাবনা হবে না? আর ভেবেওছিলুম, নিশ্চয় অসুখ করে থাকবে।

—একটা কথার সত্য উত্তর দেবে লীলা?

তীব্র কটাক্ষে আমার মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত মিষ্টহাসি হেসে বল্লে, কি কথা বলুন?

—আমি জানি তুমি নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাও, অন্য অনেকে যা জীবনে কখনো পারে না। আমার কাছে কিছুতেই কি নিজেকে জানাতে পারো না?

—বেশ মিষ্টি কথাগুলি বল্লেন তো; আমার যে গর্ব্ব হচ্ছে! তাতে আবার আপনারা মনস্তত্ব বোঝেন—!

—লীলা—

আমার কণ্ঠস্বরে অতর্কিতে অনেকখানি আকুলতা প্রকাশ লাভ করল।

আবার তেমনি হাসি।—আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন দেখি, জ্বর বাড়তে পারে। না, আর একটি কথাও নয়।

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে বল্লে, বাঃ বেশ সাজানো তো—এ ছবিটা চমৎকার! আপনার taste আছে দেখছি।

একটা বড় আয়নার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে হাতের মৃদু স্পর্শে চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে নিয়ে দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে চলে গেল।

নদীর ধারে দেখা। প্রতিমার মত স্থির হয়ে জলের দিকে চেয়ে আছে। কাছে গিয়ে ডাকতেই চমকে ফিরে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখখানি অপ্রসন্ন। একটা

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করল। তারপর একটিও কথা না বলে দ্রুতপদক্ষেপে সে স্থান হতে চলে গেল।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়েছিলুম। যেতে যেতে একবার পিছনে চাইল। তারপর দাঁড়িয়ে কি ভেবে নিয়ে ফিরে এসে বল্লে, মীরা আসে নি? বাড়ীতে বসে আছে বুঝি?

—আসবে এখনি।

চুপচাপ। ম্লান মুখ, বিষাদাচ্ছন্ন। সহসা প্রশ্ন করল, আমাকে অপমান করতে আপনার বড় ভাল লাগে, না?

—অপমান? আমি তোমাকে অপমান করেছি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ করেছেন! আমি ভণ্ড, না? অভিনয় করি, নিজেকে যা নই তাই দেখাই? আর আপনার দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকি?

—আমি এ সব কথা বলেছি? কি বলছ লীলা?

—তার চেয়ে সোজাসুজি বলুন না কেন, আমি মিথ্যাবাদী? এত অপমানের পর আর একটায় কি যায় আসে?

কণ্ঠে কি উত্তাপ! বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে উঠেছিলুম। সারা দেহ উত্তেজনায় কাঁপছে, মুখ পাংশু বর্ণ। সহসা আমাদের চারদিকের বাতাস যেন এক প্রচণ্ড কলহের বিষাক্ত বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সবেগে ফিরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। গর্ব্বোদ্ধত চরণযুগলের দ্রুত সঞ্চালন ক্রমে অদৃশ্য হল।

পরদিন সকালে একটা লেখা শেষ করছি, অত্যন্ত অপ্রত্যাসিত ভাবে মীরার হাত ধরে সমাগত হয়ে সহাস্যে বল্লে, এতক্ষণে রাগ কমেছে তো? ক্ষমা করতে পেরেছেন?

মুখে সে উত্তেজনার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। মীরাকে বুঝিয়ে বল্লে, জানিস্, কাল আমাদের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে, দোষ অবশ্য ওঁর।

—রাগ আমার, না তোমার?

—আচ্ছা বেশ, আমার। হল? এখন শুনুন, কাল মীরাকে আর আপনাকে আমাদের বাড়ী চা খেতে হবে। আমার আরো ক'জন বান্ধবী আস্‌বে, ভাব করিয়ে দেবো! বলুন, ঠিক যাবেন, যাবেন, কি যাবেন না?

—যাবেন না বল্লে কেউ কি যেতে পারে?

—সত্যি? দীপ্ত চক্ষুদুটি তুলে ধরল। কিন্তু বেশী punctual হবেন না। চায়ের সময়ের অনেক আগে যাওয়া চাই।

পরদিন যেতেই বল্লে, আপনি একটু এদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি ছুটো কাজ সেরে আসছি, তখন গল্প করব। এই মাধবী, আয় না ভাই এদিকে—সুহাস বাবু তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন।

খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লে, এ কি, আপনি চুপচাপ এখানে ঘুরছেন? ওদের ভাল লাগল না? ... ওঃ বুঝেছি, কবিত্ব এসেছে বুঝি! আচ্ছা চলুন তো বাগানে যাই, সেখানে যত খুসী কাব্যি করবেন।

—সে তো এখানেও হতে পারে।

তর্জ্জনী তুলে ভ্রূভঙ্গীসহকারে বল্লে, খবরদার, আমি আজ hostess, হুকুম মানতে হবে, চলে আসুন।

বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড বাগানটায় তখন সন্ধ্যা নামছে।

—কি লাজুক আপনি, ঠিক মেয়েদের মতন। না, এটা বুঝি আপনার মৌলিকতা? লেখকদের একটু বিশিষ্টতা দেখানো চাই কিনা!

উত্তর দেবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়ে বল্লে, আচ্ছা লাজুক নয়, একেবারে নির্লজ্জ। কিন্তু বলুন তো আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনার এত বিশ্রী লাগে কেন? আমি একটা bore, না?

—এ আবিষ্কার তুমি কবে থেকে করেছ? কিসে বুঝলে বিশ্রী লাগে?

—লাগে না? ঠিক? আমার পরম সৌভাগ্য! কি অসীম দয়া আপনার!

চাপা হাসির ছটায় সারা মুখ উজ্জ্বল। খানিক পরে সহসা আপন মনে মৃদুকণ্ঠে একটা গানের দু' চরণ গাইতে সুরু করে দিল।

'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।

চারদিক তখন কালো হয়ে আসছে ; কি একটা ফুলের সুতীব্র গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে।

অকস্মাৎ গান থামিয়ে নত দেহে একটি গোলাপের কুঁড়ির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

—কি সুন্দর তোমার গান—কথাগুলি অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমার কণ্ঠ হতে বাহির হয়ে আসে।

তীব্রবেগে ফিরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের উপর মনোভাব পাঠ করে নিল। ... দুই চক্ষে বিদ্যুতের মত আনন্দের ঝলক।

—সত্যি? সত্যি ভাল লাগল?

প্রতিশোধের বাসনা মনে প্রবল ছিল। স্থির করেছিলুম আর কখনো বিনা অনুরোধে লীলার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব না। তাই তার দৃষ্টিতে সে তৃপ্তি ও গর্ব্বের দীপ্তি ছিল, তাতে আমার ক্ষণেকের আত্মবিস্মৃতি কাটিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর করলুম, হ্যাঁ, এখানে দু'তিন জন ছাড়া আর কারুর গলা তোমার মত ভাল নয়।

কে যেন সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখে ছাই মাখিয়ে দিল। দু'পা পিছিয়ে গেল। কাঁপছিল, হাত ধরে ফেলে বল্লুম, ও কি হল?

আমার কণ্ঠের বিদ্রূপ যেন ওকে কষাঘাতে সজাগ করে দিল। মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হাস্যে লুটিয়ে পড়ল। অবরুদ্ধ কণ্ঠ সহজ করার ব্যর্থ প্রয়াসে বল্লে, ঠাট্টা বোঝেন না? ভাবছেন সত্যিই আপনার ভাল লাগায় আমার কিছু যায় আসে! সে হাসি আর থামতে চায় না, কারণ জানতো, থামলেই উদ্গত অশ্রু রোধ করা কঠিন হয়ে উঠবে।

... তপ্ত নিশ্বাসের মত বাতাসের স্পর্শ ; আকাশ তারায় আচ্ছন্ন। ফিরবার সময়ে একটি কথাও বল্লে না। মুখ তখনো রাঙা ; চোখে যেন সারা বিশ্বের শ্রান্তি। কি ক্লান্ত, অসহায় ওর প্রাণ! রুদ্ধ ব্যথার আবেগে পরম করুণায় আমার বক্ষ ভরে উঠল। উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস গোপন করার প্রাণপণ প্রয়াসে দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে মনে মনে বল্লুম, না না—এ আমার পারতেই হবে। গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে লীলা আমার এগিয়ে চলুক ; চোখের জলে অস্পষ্ট বাইরের জগৎ হতে সরে গিয়ে দৃষ্টি ওর মনের দিকে প্রসারিত হয়ে উঠুক ; আর ওর অতি ক্ষুদ্র ব্যথায়, ক্ষীণতম ক্রন্দনের বাষ্পে আমার সমস্ত অন্তর জলে উঠুক।

(৩)

যখন দেখলুম নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই আকস্মিকভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে, বুঝলুম, কোনো এক দিকে আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘনিয়ে আসছে। পার্ব্বত্য প্রপাতের মতন ; নামে যখন, মধ্যপথে থামতে জানে না। মেয়েদের মনের এই রূপ-বৈচিত্র্য আমার জানা ছিল, তাই বুঝেছিলুম, লীলার যে মনোভাব মহাবেগে সম্মুখে চলার পথে অগ্রসর হয়েছে, অচিরেই তার পরিণতি আসছে। হয় নিজেকে নিঃশেষে দান করে ফেলবে, অথবা আমার জীবনের পথ থেকে চিরদিনের মত সরে যাবে। এই আমি চেয়েছিলুম। মিথ্যাকে সত্য ভেবে নিয়ে আত্মতৃপ্তির জন্য প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা নয়, তাকে মিথ্যা বলেই পরিহার করা—তাতে যত বেদনাই হোক্। আর যদি লীলার এ মনোভাবে সত্য থাকে, নিবিড় আনন্দে তাকে গ্রহণ করা।

এত লোকের মাঝে ঐ লোকটিকে আশ্রয় করে সে আমার প্রতি প্রত্যাঘাত কঠিন করতে চায়! জানতুম, নরেন্দ্রনাথ চিরদিন লীলার সর্ব্ববিধ বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করে এসেছেন, এবং কোনোরূপ অপমানের আঘাতেই তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায় নি। শুধু লীলা নয়, লীলার সমবয়সী সকল মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না, এবং এইরূপ সংযমহীন শ্রদ্ধা যে মেয়েদের চোখে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের অভাব-জ্ঞাপক, এ সংবাদ তাঁর অগোচর ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে এসেই দেখি, সে বেড়াচ্ছে ; একা নয়, সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ। আমাকে দেখে কাছে এগিয়ে এসে বল্লে, আসুন, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই।

—নরেনকে যে অনেকদিন থেকেই জানি।

—ওঃ তাই নাকি? আপনি দেখছি সবজান্তা। আচ্ছা বলুন তো আমরা এখনি কি পরামর্শ করছিলুম?

জানেন না? ঠিক হল, আমি, মীরা, রাণুদি আর কমলা—এই চারজনকে নিয়ে দ্বারভাঙ্গা ঘাটে একটা ফটো তোলা হবে। ইনি নিজের ক্যামেরা আনবেন। গঙ্গার জল ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড হলে কি চমৎকার দেখাবে! বলুন না নরেন বাবু, আপনি তো অনেক ভাল ভাল কথা বলে থাকেন—মনে হবে না, ঠিক যেন জল-দেবীরা খেলা ছেড়ে উঠে এসেছেন?

দুষ্টুমির হাসি-ভরা মুখ! খানিক পরে যেন চিন্তান্বিত ভাবে বল্লে, আচ্ছা, আপনিও তো বেশ ছবি তোলেন, নরেন বাবু আমাদের সঙ্গে বসুন না কেন, আপনি expose করবেন—সেই বেশ হবে।

নরেন বল্লে, আমি কেন, সুহাস বসলেও তো হয়।

তার দিকে ফিরে সুমিষ্ট স্বরে বল্লে, আপনার পোজিং আমার খুব ভাল লাগে কিনা, তাই—।

কৃতজ্ঞ চক্ষে লীলার দিকে চেয়ে নরেন্দ্রনাথ একবার বক্র-দৃষ্টিতে আমার মুখের চেহারা দেখে নিলেন।

—মীরা আবার যা স্লো! আমি আপনাদের বাড়ী গিয়ে ওকে ডেকে আনবো 'খন। দেরী হয়ে গেলে তোলবার মত আলো থাকবে না।

পরদিন আমার ঘরে প্রবেশ করে চারদিকে চেয়ে দেখে বল্লে, ভারি অগোছালো আপনি; টেবিলটা কি করে রেখেছেন দেখুন তো। লেখক হলে বুঝি অগোছালো দেখানো নিয়ম? মীরাটা কি করে, দেখতে পারে না? আমি থাকলে—

মুখ লাল করে নীরব হল।

মুগ্ধ-চক্ষে তার ক্ষিপ্র হস্তের কাজ দেখি। বই আর পাণ্ডুলিপির রাশি থাকে থাকে সাজিয়ে রাখে। নীল রঙের সাড়ির ওপর কালো চুল ছড়ানো; সুনিবিড় চুলের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র গ্রীবার প্রান্ত দেখা যায়।

সহসা নতমুখে একটা খাতার পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লে, আমি ফটো তোলাবো না।

—সে হয় না; সব ঠিক্‌ঠাক্ রয়েছে।

ছোট্ট মেয়েটির মত আবদারের ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে বল্লে, আমি তোলাবো না, শুধু ওদের নিয়ে হোক্।

—ছেলেমানুষি কোরো না, দেখি মীরার কত দেরী।

—হয় নি, চুল বাঁধছে; আপনার যেতে হবে না, থামুন।

কণ্ঠের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ফিরে চেয়ে দেখি, দু'-চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছে।

—ও কি হল?

চুপচাপ। বিদ্রূপ হাস্যে বল্লুম, লক্ষ্মীটি, চলো, তোমার ফটো তুলতে পেলে আমার আনন্দ হবে।

কঠিনকণ্ঠে বল্লে, ফ্লার্ট্ করতেও জানেন দেখছি।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে শান্ত স্নেহের স্বরে উত্তর করলুম, তোমার মনে যখন কষ্ট দিই, আমার নিজেরও তখন কিছু কম কষ্ট হয় না। কিন্তু এত কষ্ট দিলেও তুমি রাগ কর না কেন লীলা?

আরক্ত মুখ ঈষৎ নত করে একপাশে ফিরিয়ে নিলে।

হাত ধরে বল্লুম, বল, কেন?

সমস্ত দেহ তার বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে উঠল। আনত চোখের পাতায় অশ্রু দেখা দিল; তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।...

ক্ষণকালের জন্য। মীরা যখন এল, আত্মগোপনের অসাধারণ শক্তিবশত সে মুখে তখন চাঞ্চল্যের ছায়াটুকুও নেই; গভীর হাস্যাবৃত চোখের দৃষ্টিতে মনোভাব কিছুই পড়া যায় না। ঘরের বাহিরে এসে বাগান দিয়ে যেতে যেতে ওষ্ঠে কৌতুকহাস্য ঝলমল করে উঠল।

মীরার শাড়ীর প্রান্ত একটা গাছের কাঁটায় বেধে গিয়েছিল। সযত্নে খুলে দিতে দিতে লীলা বল্লে, তোর তো ভাই দুষ্মন্ত নেই, তবে এমন হয় কেন?

লজ্জায় রাঙা হয়ে মীরা বল্লে, যাঃ, কি মেয়ে তুই—সুহাস-দা রয়েছে আর এমন করে বলছিস্?

মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে বল্লে, তোর সুহাস-দা রয়েছে তো আমার কি—? Blush করলে তোকে ঠিক শকুন্তলারই মতন দেখায়। আমি কিন্তু ভাই অনসূয়া কি প্রিয়ম্বদা হতে পারবো না—তা বলে রাখছি।

—তার মানে নিজেই শকুন্তলা হতে চাস্; এই তো?

চোখে তার যেন বিদ্যুত খেলে গেল; দুই বাহু দিয়ে মীরার গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে মুখ রেখে বল্লে, কি বুদ্ধি, ঠিক ধরেছিস্ ভাই!

আমার দিকে মাথা ঈষৎ হেলিয়ে বল্লে, কলেজে যিনি শকুন্তলা পড়াতেন, তাঁর দিকে চেয়ে কেবলই মনে হত এতগুলি জীবন্ত শকুন্তলার মধ্যেও মানুষ সত্যিই কি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার মনে ঐ ভাল ভাল রূপবর্ণনার শব্দগুলো সমাস করছেন? না—এটা শুধু বাইরের ভাব?

—লীলা—

—ওঃ তোর বুঝি লজ্জা করছে? ভাবছিস্, কি বেহায়া? তোর দাদার তো বেশ বেপরোয়া ভাব—আমার কথাগুলো ত বেশ enjoy করছেন বলেই বোধ হচ্ছে।

একটা গোলাপ ঝাড়ের পাশে এসে লীলা কয়েকটা ফুল তুলল। একটা আমাকে দিলে, আর একটা মীরার ব্রোচে পরিয়ে দিতে দিতে বল্লে, দেখ্ দেখি ফুল তোকে কি সুন্দর মানায়।

মীরা হাসি মুখে জানালে, তুই আমায় একটুও ভালবাসিস্ না লীলা!

—তার মানে?

—লাল ফুলটা সুহাস-দাকে দিলি, আর সাদাটা আমায়! লাল কিসের চিহ্ন জানিস্ তো?

—যাঃ ভারি দুষ্টু। ঈষৎ রক্তিম মুখে লীলা তার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল।

বলতে বলতে অকস্মাৎ লীলার মুখ বিবর্ণ ও পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ, বিরক্তিভরা চক্ষে মীরার দিকে চেয়ে উত্তপ্তস্বরে বল্লে, তুই এখনো একেবারে ছেলেমানুষ মীরা। কুড়ি বছরের হলে কি হবে, এখনো স্কুলের মেয়ের সামিল।

অবাক হয়ে মীরা প্রশ্ন করল, কেন শুনি?

—শুনবি? বোধ হয় বুঝ্‌বি না। নারীর স্বভাব তোর মধ্যে আসে নি।

—তার মানে?

—নারী মাত্রেই স্বভাবতই এক একজন actress. তুই এখনো তা হতে পারিস্ নি। সত্যিকারের জীবনে অভিনয় করতে তোকে কখনো দেখলুম না। ছোট মেয়ের মত সব সময়ে তোর মুখ আর মনের কথা একেবারে এক!

—কি বল্লি, actress!

মীরা ভয়ানক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। হোতেই হবে, স্বভাবের ধর্ম্ম। সব সময়ে নিজের আসল রূপ লুকিয়ে মুখে মুখোস পরে থাকা।

সকলে নির্ব্বাক্। বহুক্ষণ আপনাতে আপনি মগ্ন থেকে সহসা কি ভেবে হেসে উঠে লীলা বল্লে, ইস্, মুখটা অমন গম্ভীর করিস্ না মীরা। ছেলেমানুষের ভাল দেখায় না।

একদিন দেখা হতেই বল্লে, কাল চল্লুম এখান থেকে।

—কাল? এত শীগ্‌গির?

—হাঁ, যেতেই হবে; মা লিখেছেন। আর ক'দিন থাকলে বেশ হত। তা যাক্—; দুটোয় গাড়ী, ষ্টেশনে যাবেন তো? যাবেন ঠিক, একটু তাড়াতাড়ি।

... রাশি রাশি চিন্তা সেদিন সমস্ত রাত্রি ধরে কেন্দ্রভ্রষ্টের মত মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরতে লাগল। এক রাত্রের তীব্র বেদনাও যেন মাঝে মাঝে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অশ্রু-সমুদ্রকে ডিঙিয়ে যায়।

ষ্টেশনে পৌছে দেখি, স্থির হয়ে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কত কি ভাবনা।

কঠিন নির্ণিমেষ চক্ষে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর সহসা মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হল। সহাস্যে বল্লে, আসুন। বলে' ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

অত্যন্ত সহজ ভাবে বল্লে, হার মানলুম এবার।

—হার কিসের? আর কবে দেখা হবে জানি না, আজও কি তুমি স্পষ্ট করে নিজের কথা বলতে পারো না লীলা, সে যতই কঠিন হোক?

—হার মানছি আপনার কাছে। কিন্তু এতদিন আপনাকে পুরুষমানুষ বলেই ভেবে এসেছিলুম।

—তোমার ওরকম কথায় আমার কষ্ট হয় তা কি বোঝো না? একটা বড় অহঙ্কার তুমি আমার ভেঙেছ। তোমার মনের এখনো কূল-কিনারা পেলুম না।

পরম শান্ত অবিচল মুখখানি তার হঠাৎ নিবিড় ব্যাকুলতার রেখায় রেখায় মলিন হয়ে এল। গাঢ়স্বরে বল্লে, ক্ষমা করবেন না আমায়?—কত কষ্ট দিলুম এতদিন ধরে। বিশ্বাস হয় তো করবেন না, কিন্তু এ জন্যে কত রাগ আর ঘৃণা হয়েছে নিজের ওপর। তবু—

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে রুদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বল্লে, তবু ভিতর থেকে কে যেন জোর করে ঠিক্ এমনি করালে—

ম্লান হেসে বল্লুম, তোমায় ক্ষমা? তুমি যে আমার রাগ অভিমানের অনেক উপরে উঠেছ লীলা! মনের যে স্থানে তোমায় রেখেছি এ-সব ছোট ছোট জিনিষ তো সেখানে যেতে পায় না।

এ কথায় মুহূর্ত্তে তার চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত—কাছে সরে এসে মুখখানি তুলে ধরে আগ্রহ ভরে আমার দিকে চেয়ে রইল, কম্পিত ওষ্ঠ, উত্তেজনায় গালদুটি লাল, চক্ষে মধুর আবেশ বিহ্বল বহুদূর নিবদ্ধ দৃষ্টি।

নিমেষের জন্য আত্মবিস্মৃতি এল। অতর্কিতে যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে সহসা তার দুই বাহু সুদৃঢ় বলে বুকে চেপে ধরলুম।

মুহূর্ত্তমাত্র নিশ্চল থেকে বিদ্যুদ্বেগে হাত সরিয়ে নিয়ে সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কঠিন বিদ্রূপতিক্ত হাসি শুনতে পেলুম। অভিভূতের মত তার দিক চেয়ে দেখি, সেরূপ অদ্ভুত মুখের ভাব পূর্ব্বে কখনো কোনো নারীর মধ্যে দেখি নি। তৃপ্তি আনন্দ গর্ব্ব শ্লেষ ও তার সহিত আরো কত কি অবোধ্য মনোভাব সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে।

চিত্রিতার মত নীরব নিশ্চল। ধীরে যেমন দিনের আলো নিভে আসে, সে মুখের দীপ্তি কালো হয়ে এল। গভীর বিষাদাচ্ছন্ন; যেন কত কি শঙ্কা, চিন্তা, বেদনা। সহসা সারা দেহ তার শীতার্ত্তের মত কেঁপে উঠল। তারপর অধোমুখে অত্যন্ত মৃদুস্বরে—প্রায় চুপিচুপি বলার মত বল্লে, যাই।

... ট্রেণ চলতে সুরু করল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছে। চোখে আর সে প্রতিদিনকার হাসির আভা নেই। মুহূর্ত্তে বিশ্বজোড়া বিষাদ যেন তাতে এসে মিলেছে। যক্ষ্মারোগীর মত শীর্ণ বিবর্ণ মুখ।

একসপ্তাহ পরে শুষ্কমুখে মীরা জানালে, লীলার চিঠি পেয়েছি সুহাস-দা। অনেক কথা লিখেছে। এই মাসের শেষেই ওর বিয়ে হবে, আগে তো সামান্য আভাসে ও এ কথা জানায় নি। অনেক দিন থেকেই নাকি ঠিক ছিল।

—চিঠিটা একবার দেখাবে মীরা?

—আনছি। খানিক থেকে বল্লে, ও তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। লিখেছে দোষের ওর শেষ নেই, কিন্তু তোমার মধ্যে যে একান্ত দৃঢ়চিত্ত, পরম সহিষ্ণু মানুষটি আছে, সে যে ওকে নির্ব্বিকার মনে ক্ষমা করবে, সে কথাও ও স্মানে

আর লিখেছে, আমার বৌদি হতে পাওয়াকে সে তার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করতে পারত, কিন্তু অনেক দিনের পরিচিত আর একটি ব্যক্তিকে তাতে যে গভীর বেদনা দেওয়া হবে, তা ও কিছুতেই সইতে পারবে না।

উদ্বিগ্ন স্নেহে মীরা বল্লে, কষ্ট হচ্ছে সুহাস-দা? লক্ষীটি, আমার কাছে লুকিয়ো না।

জোর করে একটু হাসলুম। তার গালের উপর নেমে আসা চুলের গোছাটি মাথায় তুলে দিয়ে সহজ ভাবে বল্লুম, কি যে বলিস্ মীরা!

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে ছেলেমানুষের মত আমার দুই হাত ধরে বল্লে, কেন লুকুচ্ছো আমার কাছে?... ওকে ভুলে যাও ভাই। ও কিছুতেই তোমার যোগ্য নয়। ও রকম মেয়ে নিজে জ্বলে, অন্যকে জ্বালায়।

* * *

সুহাসের কথা শেষ হইল। ঘরের সকলেই চুপচাপ।

একটি মানুষের মৌন ব্যথা যেন সকলের অন্তরেই বিশেষ একটা নাড়া তুলিয়াছে।

সহসা অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া সুহাস কহিলেন, লীলার কথা অনেক ভেবে দেখে আমি বুঝেছি, ও একটা টাইপ। এ টাইপ-এর মেয়েদের মধ্যে অভিনয়ের আকাঙ্খা প্রবল। ওরা এক বিশেষ ভাবের আর্টিষ্ট্।

ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, জয়ের বাসনা এদের অন্তরে দেহ-মনের ক্ষুধার মতই জোরালো আর মনের এই ধর্ম্মবশত তাদের আপন আপন স্বাভাবিক শক্তির ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়। তাই অনেক সময়ে প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা অন্যের জীবনে দাগ কেটে দিয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে দাগ হয় তো জলের আনা, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে শত চেষ্টাতেও তার এতটুকু মুছে ফেলা যায় না।

—আর ওদের মনে, মেয়েদের? একটুও কি বিকার আসে না, অভিনয়ের ফলে? প্রশ্নকর্ত্তা একজন সমালোচক।

কি যেন ভাবিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সুহাস বলিলেন, হয় তো আসে, অন্তত লীলার এসেছিল। চিঠিতে বলেছে না, যদি আর একটি ব্যক্তিকে ব্যথা দেওয়া না হত তা হলে—।

এক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতায় সহসা নিজের অতর্কিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দে বিষম লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া সুহাস বলিতে লাগিলেন,—

হয় ত মনে হতে পারে, আমার জীবনটা ট্রাজেডি, কিন্তু কেন যে তা নয়, সে আমি ঠিক বুঝাতে পারবো না। শুধু এ কথা বলতে পারি, যদি কিছু শূন্যতা এসে থাকে, সৃষ্টির আগ্রহে আর সবটুকু পূর্ণ হয়ে আছে। আর আর্টিষ্টের কাছে সৃষ্টির আনন্দ যত গভীর তেমন আর কিছুই দেখি না; লীলার মনের এই বিশেষ গতির জন্যই পরিপূর্ণ রূপে এ আনন্দ আমি লাভ করতে পেরেছি—যেহেতু তার কাছ থেকেই জীবনের সবচেয়ে গভীর দুঃখ আমার এসেছে।

—আপনি এখনো কি তাকে ভালবাসেন?

—ভালবাসি? নিরতিশয় বিরক্তি সহকারে মুখ বিকৃত করিয়া সুহাস নীরব রহিলেন।

—তার প্রতি ঘৃণার ভাব নেই?—মনে মনে?—এবার জিজ্ঞাসু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক।

গভীর চিন্তামগ্নভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া সহসা সুহাসের চক্ষুদুটি জ্বলিয়া উঠিল; মুখের চেহারা অত্যন্ত কোমল ও শান্ত মধুর হাস্যে রঞ্জিত দেখাইতে লাগিল।

—ঘৃণা? ··· না সে অসম্ভব!

সুরের দুলাল

নজরুল ইসলাম

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন্-শেষে
সুরের দুলাল, আস্‌লে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে।
আজো মালা হয় নি গাঁথা হয় নি আজো গান রচন,
কুহেলিকার পর্দ্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রংমহল,
হয় নি ক' সাজ রূপকুমারীর নিদ টুটেছে এই কেবল।
আয়োজনের অনেক বাকী—শুন্‌নু হঠাৎ খোশ্‌খবর,
ওরে অলস, রাখ্‌ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আস্‌ল ঘর।
ওঠ্‌ রে সাকী থাক্‌ না বাকী ভর্‌তে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভর্‌ব দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।

দম্ভ ভরে আস্‌ল না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান,
যাহার আসার খবর শুনে গর্জ্জাল না তোপকামান,
কুসুম দলি' উড়িয়ে ধূলি আস্‌ল না যে রাজপথে
আয়োজনের আড়াল তারে কর্‌ব গো আজ কোন্‌ মতে।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি।
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙ্গিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখী যায় কুলায়।
সে এল যে আমন ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রাণের এই সুঘ্রাণেরি পথ চিনে।
আনে নি সে হরণ করে রত্নমাণিক সাত রাজার
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ কণ্ঠহার।

সুরের সেতু বাঁধ্‌ল সে গো উর্দ্ধে তাহার শুনি স্তব
আস্‌ছে ভারত-তীর্থ লাগি শ্বেতদ্বীপের ময়্‌দানব।
পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পূবের দেশের বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী লাজ মুছেছি অদৃষ্টের।
কণ্ঠ তোমার যাদু জানে বন্ধু ওগো, দোসর মোর!
আসলে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।
তোমার গলার বিজয়মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বসলে জুড়ে হৃদয় মন
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল-লিখন॥*

বিগলিত শিলা

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

সব চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল গানের ঐ যন্ত্রটা। কণ্ঠের আধা-সহজ ও আধা-কৃত্রিম সুরের উপর যন্ত্রের কর্কশ ঘর্ষণ—যেন যন্ত্রদৈত্যের মুখের উপর বিকট ব্রণ।... যন্ত্র এবং কণ্ঠ—উভয়ের মিলিত শব্দ যে সুরের সৃষ্টি করে তাহাতে সঙ্গীতের আদি রস-স্রষ্টার পুলকিত হইবার কথা নয়।... একগুঁয়ে ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ যেন অবিশ্রান্ত রুখিয়া রুখিয়া আসিয়া কানের ভিতর ঢালিয়া পড়ে—

শিল্প তাহার নীচে তলাইয়া যায়—

মনে হয়, ভয়াবহ নিষ্করুণ কাণ্ডের উপর একটা আবরণ পড়িয়াছে।

... কানে আঙ্গুল দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়, থামো—থামো। কিন্তু সীতা চেড়ির কণ্ঠের নির্য্যাতন যে-গুণে সহ্য করিয়াছিলেন, সে গুণ মানুষের আজও আছে।—তবু মনে হয় পালাই।...

সাম্‌না সাম্‌নি দুটো বাড়ী; মাঝখানে পাঁচফুট চওড়া রাস্তা। এ-পারের বাড়ীটাতে আমরা থাকি দশ বারোজন।... তারি সাম্‌নে ও-পারের বাড়ীতে গানের যন্ত্রটা বাজে।—

* ২১-এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সম্বর্দ্ধনা সভায় পঠিত।

শুধু তাই নয়—

নুপূর বাজে, মন্দিরা বাজে, তবলা বাজে, উল্লাসের হল্লা বাজে, সুরাপাত্রের কাঁচ বাজে—

মানুষের দেবধর্ম্মকে, মানুষের প্রতি মানুষের সহিষ্ণুতাকে নিগৃহীত করিয়া এত কাণ্ড ঘটিয়া যায়। ... সভ্যতার উন্মেষেই নাকি এই ভাবটাই জাগিয়াছিল যে, যে প্রতিবেশী অদূরে দ্বিতীয় তরুকোটর আশ্রয় করিয়া আছে সে যেন আমায় শ্রদ্ধা করে, যেন মমতা ক্ষয়িত হইয়া ভীত অসংযত রিপুর মত বাহিরে মৌন থাকিয়া ভিতরে সংক্ষুব্ধ হইয়া না ওঠে।—

কিন্তু এ-সবের অতিশয় সূক্ষ্ম পরিমার্জ্জিত অনুশীলন সত্ত্বেও ঐ সবগুলি নিত্য বাজে।—

যে বাজায় বা যার আশ্রয়ে বাজে, বা যে আছে বলিয়াই বাজে, তাহাকে কখন চোখে দেখি নাই। ... পর্দ্দার আড়ালে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কখন তরল কখন তীব্র, কখন শ্লথ, কখন মত্ত। ... পর্দ্দা সরিয়া হঠাৎ চোখে পড়ে, বসনপ্রান্তে অলক্তকের রক্তচ্ছটা, কেশের উচ্ছ্বাস—কিছুই স্পষ্ট নয় ... তাহারা যেন আলোক-পথে উড়িয়া আসে, আলোক-পথেই উড়িয়া পালায়।

দশটি লোক থাকি মেসের বাড়ীতে।—

কেউ মুখ টিপিয়া হাসে, কেউ মনে মনে চেয়ে থাকে সেই দিকে; কিন্তু সবারই মনে হয়—এটা কি ভাল, এই লুকাইয়া থাকা! একেবারে দেখা না দে'য়া! ... এই নিরুৎসুক উদাসীনতা পুরুষের ভাল লাগে না—কোথায় যাইয়া অতি গোপনে বিদ্ধ হয়; নিজেকে মনে হয়—বর্ব্বর অপদার্থ।

তা হোক্—

কিন্তু কানের পাশেই এত সোরগোলও রোজ রোজ সহ হয় না, বিশেষত যন্ত্রের সুরাবৃত্তি ... যেন ক্রমাগত ঘা দিয়া দিয়া মগজের ভিতর পেরেক ঠোকে।—

নরেশ অগ্রণী—

সে এবং আরো জন তিনেক যাইয়া বাড়ীওয়ালাকেই ধরিয়া বসিলাম।

তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমাদের আগমনের এবং অনুকম্পার মর্য্যাদা রাখিলেন বটে কিন্তু মূল কথাটা তেমন কানে তুলিলেন না; বলিলেন,—দেখছেন ত ব্যাপারটা। আপনারা দেন সাতটা ঘরের পঞ্চান্ন টাকা ভাড়া, ও দেয় ছটো ঘরের পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, টেক্স বাদে। কি করে এই লাভটা ছাড়ি বলুন! বলিতে বলিতে হর্ষভরে তাঁর চোখের পাতাটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল।

—তবে আমরাই ছেড়ে দি?

প্রশ্ন শুনিয়া লোকনাথ কিছুমাত্র ইতস্তত বোধ করিলেন না, বলিলেন,—অক্লেশে। মহেশ্বর বাবু একটি ভাড়াটের কথা কালও বলছিলেন; পরিবার নিয়ে থাকবে; ভাড়াও কিছু বেশী দিতে চায়।

আমাদের দিকে চাহিয়া লোকনাথের চোখের পাতা মিনিটখানেক স্থির হইয়া রহিল।

"তবে থাকুন আপনি"—বলিয়া নরেশ তেরিয়া হইয়া উঠিতে তাহাকে হাত চাপা দিয়া অবনীবাবু বলিলেন,—ঘর ছটোই বটে, ভাড়াও পঁয়ত্রিশই বটে, কিন্তু টাকার অঙ্কের পরিমাণ ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটার আর একটি দিক আছে! সেটা ভেবে দেখেছেন কি?

লোকনাথ বলিলেন,—বিশেষ দিকের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে নতুন একটা দিক্ দেখতে পেলে সে-বিষয়ে ভেবে দেখতে পারি।

—পক্ষপাতিত্ব আছে আপনার ঐ টাকার দিকটার প্রতি। সে কথা মরুকগে। ... ঐ টাকার সঙ্গে আপনি কতটা, ক্ষমা করবেন লোকনাথ বাবু, আপনি কতটা অধর্ম্ম অর্জ্জন করছেন তা আপনি জানেন না। প্রত্যেকটি টাকার প্রত্যেকটি অণু মানুষের আয়ুঃ স্নায়ু আর নিঃশ্বাসে পূর্ণ। আপনার সিন্দুক মানুষের সারপদার্থের প্রেতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। দেখে নেবেন পরে।

—আচ্ছা, এ দিকটা ভেবে দেখব—বলিয়া লোকনাথ ডেপুটেশন্‌কে বিদায় করিয়া দিলেন; কিন্তু মানুষের আয়ুঃ

প্রভৃতির অবস্তর প্রেতের কথায় ভয় পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

পথে জগত্তোষের একটা কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল—বড় ভুল হয়ে গেছে ত'; ১৩৩ ধারার কথাটা শুনিয়ে দিলে হত। দেখব ও-বেলা।

অবস্থা যখন এম্‌নি তখন একদিন ব্রহ্মচারী অতুলানন্দ পূর্ণাবয়বে এবং তাঁহার একটি চারা-শিষ্য আমাদের এই মেসে আসিয়া কিছুদিনের জন্য আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্মচারী রূপে অতুল, জ্ঞানে অজেয় এবং বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়; চারা-ব্রহ্মচারীটি ঐ সব গুণে কেবল পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। ... উভয়ের এ-স্থানে আগমনের উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মহিমা প্রচার, স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের অবিচ্ছেদ্য যোগসন্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কিছু চাঁদা আদায় কাশীস্থ আশ্রমের জন্য। ... দিন বিশেক অবস্থান করিবেন।

কিন্তু দুর্দ্দৈব এম্‌নি, ঠিক এই দিনটাতেই সম্মুখের ঐ বাড়ীটায় উচ্ছৃঙ্খলতার আর কিছু বাকি রহিল না—

কণ্ঠসঙ্গীতে শুরু হইয়া উদ্বমনে সেই তাণ্ডবতার সমাপ্তি হইল।

অতুলানন্দ কম্বলশয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, বামাকণ্ঠপথে তান নির্গত হইতেই তিনি শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

গান আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল—

কিন্তু অতুলানন্দ নূতন—

কাজেই গানের দিকে আদৌ মন না দিয়া আমরা সকৌতুকে অতুলানন্দের দিকেই মন দিলাম।

অতুলানন্দ ভ্রূভঙ্গী করিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন। ...

আগে লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু এখন লক্ষ্য না করিয়া পারিলাম না যে, তাঁর চক্ষু দু'টি কৃষ্ণতর কিন্তু ক্ষুদ্র এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ ... তারা দু'টি সহসা নিস্পন্দ হইয়া দৃষ্টি যেন বস্তুর উপর চাপিয়া হুল বিঁধাইয়া বসে; মুখাবয়বের সমুদয়টা সুন্দর কিন্তু খণ্ড হিসাবে শ্রীহীন।

অতুলানন্দের অন্তর্নিবিষ্ট দূরত্ব, নির্ব্বিকার শান্ত ভাবটাই আশ্চর্য্য করিয়াছিল বেশী; কিন্তু কারণ ঘটিতেই দেখা গেল, সেই ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্রূপে শোকে মিশিয়া এমন একটা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যাহা সম্মুখে করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা যায় না।—অথচ কেমন একটা আকর্ষণের স্পর্শও যেন অনুভব করিলাম।

মাতালের উদ্দামতার শব্দই শুধু কানে আসিতেছিল; অতুলানন্দ সেই দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া আমরাও তেমনি নিঃশব্দ রহিলাম; কিন্তু অতুলানন্দের কণ্ঠ দিয়া যখন স্বর বাহির হইল, অপার বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তাহাতে কিছুমাত্র উত্তাপ নাই।

বলিলেন,—এত কাছে?

সুরে বিস্ময় ছাড়া আর কিছু ছিল না—

কিন্তু কথাটা লজ্জা দিল।

এত কাছে এই পাপের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, আর ইহারা অন্ধ, অচেতন, উদাসীন ... কথার সুরে ইহারই বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ না থাকিলেও নিজেদের নিশ্চেষ্টতা যেন হঠাৎ বিরাট হইয়া দেখা দিল।

অতুলানন্দ গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

বলিলেন,—সব চেয়ে আশ্চর্য্য নারীর এই গণিকাবৃত্তি; কিন্তু মানুষ বোধ হয় হতাশ হয়েই এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান ত্যাগ করেছে, এখন শুধু চেষ্টা, এটাকে সীমাবদ্ধ করা, পৃথিবীকে নির্ম্মুক্ত করা নয়। সভ্যতার এতবড় পরাজয় আর কোনো ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। .. আমি একটু আসি। বলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নামিয়া গেলেন।

চোখ ডাগর করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া নাবালক ব্রহ্মচারী বলিল,—স্বামীজি কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, জানেন?

সুশীল বলিল,—অনুমান করতে পারছি।

কিন্তু তাঁর ক্রুদ্ধ চেহারাটা আপ্‌নারা অনুমান করতে পারছেন না। আমি এমন লোক দেখেছি যে, ওঁর রাগ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।—বলিয়া বিকাশানন্দ একটুখানি হাসি যেন ভাসাইয়া আনিল।

কিন্তু গুরুজীর পক্ষ হইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইবার মধ্যে হর্ষ ছাড়া আর যাহা ছিল তাহার কাঠিন্য শিষ্যের হাসির ছটায় কিছুমাত্র মনোহর হইয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারিলাম না।

সামনের বাড়ীর কোলাহল হঠাৎ থামিয়া গেল।

"প্রভুর আস্‌তে আজ্ঞা হোক্"—বলিয়া জড়িতস্বরে কে অভ্যর্থনা করিল।

একজন বলিল,—এই একটু আনন্দ করা যাচ্ছে, প্রভু; দুদিনের তরে একটু হেসে নে'য়া।

তারপর একজন বলিল,—হ্যাঁ দেখুন, দেখবার মত বটে।

বোঝা গেল, অতুলানন্দ নারীটিকেই এখন লক্ষ্য করিতেছেন ... সে তাঁহার ক্রোধ সহ্য করিতে পারিতেছে কি না কে জানে! ...

পরক্ষণেই এমন একটা হৈ হৈ অট্টরোল উঠিল যাহার তুলনা নাই; তারপরই একটা দড়্‌বড়্‌ শব্দ ...

অতুলানন্দ মেসে আসিয়া উঠিলেন—

তখন তাঁর মূর্ত্তি বাস্তবিকই ভয়াবহ ... বিশেষত নাসারন্ধ্রের স্ফীতি আর তলাইয়া তলাইয়া বুকের ওঠা-নামা।

বলিলেন—ভ্রষ্টা।

তাহা সকলেই জানিত—

এবং কি অর্থে তিনি শব্দটা ব্যবহার করিলেন তাহাও সকলে বুঝিল। ... সংশোধনের অতীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিজের হাতে একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়া, অন্ধ নারী ভ্রষ্টপথে চলিয়াছে। ... অতুলানন্দ খুব একটা ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছেন; এবং সেই ধাক্কাই ঐ একটি শব্দ তাঁর মুখে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।—

অতুলানন্দ ঐ একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই অতিশয় তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং তাহারই প্রভাবে বাক্‌পরায়ণ বনবিহারীও কেমন হতবাক হইয়া রহিল।

... আহারে বসিয়া অতুলানন্দ গ্রাস দুই ভাত গলাধঃকরণ করিয়াই হাত তুলিয়া রহিলেন।

অভুক্ত অন্নের সম্মুখ হইতে উঠিয়া আসিয়া অতুলানন্দ নিজের ঘরে গেলেন—

দ্রুত পদচারণার শব্দ আসিতে লাগিল।

সেটা বন্ধ হইয়া যাইতেই নরেশ কাঠের বেড়ার ফুটায় চোখ লাগাইয়া দেখিল অতুলানন্দ ধ্যানে বসিয়াছেন; চক্ষু মুদ্রিত, চক্ষুর দুই কোণ্‌ বাহিয়া জলের বিন্দু নামিয়া আসিতেছে; হাত দুইখানি কোলের উপর জড়ো করা, আলো-ছায়ার বিন্যাসে, বা অন্য যে কারণেই হোক মুখখানা অতিশয় বিষণ্ণ দেখাইতেছে। ...

—চাই চাবুক। বলিয়া অতুলানন্দ বিলম্বিতে হাত দু'খানা তুলিয়া তাঁর প্রশস্ত বক্ষের উপর শৃঙ্খলিত করিয়া চাপিয়া রাখিলেন। ... বলিতে লাগিলেন,—ঈশ্বর পরম করুণাময়, কিন্তু শূলপাণি শঙ্কর তাঁরই ভাবান্তর। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় হত্যা করতে অনুমতি দিয়াছেন, প্ররোচিত করেছেন, হিতার্থে। অধর্ম্মের জলপ্লাবনে তিনি তাঁর আনন্দের সৃষ্টিকে ডুবতে দিতে পারেন না।

—কি অভিপ্রায় আপ্‌নার?

—কুহকজাল ভেঙ্গে দেব, তাতে যে মরবে, মৃত্যুই তার শ্রেয়!

চট্‌ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অতুলানন্দ প্রস্থান করিলেন।

বেলা তখন আটটা।

আধঘণ্টার মধ্যেই যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁর গৌরাঙ্গ মুখমণ্ডলের উপর কৃষ্ণচক্ষুদুটি স্ফুরিত হইয়া দৃষ্টিকেই যেন দেহাতীত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে।... বলিলেন,—অসীম আত্মনিগ্রহের অন্তরালেও একটা বিরুদ্ধ অনুভূতি সত্তা ভিতরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রবুদ্ধ থাকেই। সেইটাকেই খাড়া করে তুলে বসিয়ে রেখে এসেছি। বলিয়া অতুলানন্দ হাসিলেন, এবং তাঁহার সে হাসিতে অতুল আনন্দই প্রকাশ পাইল :—

গিরীন বলিল,—অনুতাপে তার মঙ্গল হবে আশা করা যায়।

অতুলানন্দ বলিলেন,—অনুতাপ একটা বড় সন্দেহজনক কথা। অন্যায় আনন্দের বিনিময়ে দ্বিতীয় একটা ন্যায়-সঙ্গত আনন্দের উপায় চোখে দেখতে না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষ ঠিক অনুতপ্ত হয় না।

বোধ হইল, দ্বিতীয় একটা আনন্দের সান্ধানও তিনি দিয়া আসিয়াছেন বিশ্বা দিতে পারিবেন।

সেই দিন অতুলানন্দের বেশ স্ফূর্ত্তি দেখা গেল; হাসিয়া হাসিয়া নিজের কথাই অনেক বলিয়া ফেলিলেন, অধিকাংশই পতিতোদ্ধার সম্পর্কীয়। বলিলেন,—মানুষের মনের যে ভাগটা অধ্যাত্ম দিকে কাজ করে আর যে ভাগটা অলস, এই দুটির সংযোগের ফলেই প্রীতি উৎপন্ন হয়; কাজেই দেখা যায় প্রীতি কখনো সঙ্কীর্ণ অলস, কখনো ব্যাপক ক্রিয়াশীল। কুললক্ষ্মীতে ক্রিয়াশীল অংশ প্রবল, পুরুষে ক্ষীণ। আমার কার্য্যনীতি হচ্ছে, মানুষের মনের অলস দিকটা চালিত করা। দুটি অংশ যদি কোনোদিন সমবেগে কর্ম্মক্ষেত্রে জেগে ওঠে তবে মানুষে মানুষে আর কোনো বিসম্বাদ থাকে না; অশেষ মৈত্রীর উপায়ই ঐ।

বরদা বলিল,—কিন্তু এ ক্ষেত্রে—

—তাই ঘটাতে হবে। এই নারীর নারীত্ব আংশিক বিকশিত; সমগ্র নারীত্ব ওর জাগিয়ে দিতে পারলেই ও সব ছেড়ে পালাবে। ... ভগবান পতিতপাবন শুধু এই হিসাবে যে, তাঁর স্পর্শে পূর্ণতা লাভ হয়, খণ্ডত্ব কোথাও থাকে না; তাই যে ভগবানকে পেয়েছে যে একেবারে নির্লিপ্ত—ভেদজ্ঞান রুচিবিকার তার লোপ পেয়ে যায়; সে অমৃতের পুত্র, সে বিশ্বের মিত্র, বিশ্ব তার মিত্র।

অতুলানন্দ তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন, কিন্তু হাঁপাইতে লাগিলাম আমরা। এতবড় বক্তৃতা বসিয়া একনিঃশ্বাসে শোনা আমাদের অভ্যাস ছিল না।—কুলদা স্পষ্ট হাসিয়াই ফেলিল, কিন্তু আমার পিঠের আড়ালে মুখ লুকাইয়া।

দ্বিতীয় দিনে বড় দুঃসংবাদ পাওয়া গেল।

অতুলানন্দ আসিয়া বলিলেন,—বড় কঠিন দেখছি। কেঁদে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

—অনুতাপে?

—না; সর্ব্বস্ব আমাদের আশ্রমে দান করে নিঃস্ব হবার প্রস্তাবে।

—কিন্তু সে শুনেছি ভদ্র কয়েদখানা।

—নিঃসংশয়ে তাই। কিন্তু পৃথিবীতে পিজরার যদি এখনো কাজ থাকে, তবে কয়েদখানার কাজও আছে। কাজটা নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু তাকে বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত করে তুললেই সে একদিনেই বিশুদ্ধ নির্ম্মলাত্মা হয়ে উঠবে তা আমি আশা করি নি; তাই কয়েদখানা চাই—

হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলিয়াই দেখা গেল সেই নারীই দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—

চক্ষু মদালস ...

কিন্তু সে কি রূপ!

সেই রূপের সম্মুখে যেন নিজের নিঃস্বতার লজ্জায় প্রকৃতির মাথা হেঁট হইয়া গেছে।...

এতগুলি পুরুষের চক্ষুই শুধু উদগ্র হইয়া সেই রূপের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু মনের গতি যেন এক নিমেষেই কুণ্ডলী পাকাইয়া গুটাইয়া গেল —

স্বাভাবিক অবস্থায় রহিলেন কেবল অতুলানন্দ। তিনি হাস্যমুখে তাহার দিকে [illegible]য়া রহিলেন।

রমণী বলিতে লাগিল,—আমার নাম রেখা। তুই হতভাগা কে রে যে আমায় তাড়াতে চাস্? নিজের

ঘরে বসে আমি যদি মাতাল হই, ব্যবসা চালাই. তাতে তোর—

বলিয়া সে বাপ তুলিল ;

এবং গা দুলাইয়া দুলাইয়া আরো এমন অনেক কথা অশ্লীলাক্রমে উচ্চারণ করিয়া গেল যাহার প্রকাশ্য ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

চারা সন্ন্যাসীটি লাফাইয়া উঠিল—

তাহাকে নিবারণ করিয়া অতুলানন্দ তেমনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমরা একেবারে অভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম।... মানুষের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণার জন্ম এইখানেই—সামঞ্জস্যের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বশে—তার আর কোনো কারণ নাই।... দেহের রূপের সঙ্গে তাহার মুখের কথার অসামঞ্জস্যটাই যেন ঠেলিয়া আমাদের মুখ ফিরাইয়া দিল।

অতুলানন্দ বলিলেন,—তুমি বৃথাই গা'ল দিচ্ছ, নারী। আমি ওদিকে একেবারে অচেতন।

—চেতিয়ে তুলবে তোমায় ডাণ্ডায়। রামবিলাস? বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে রেখা নামিয়া গেল।

রামবিলাসকে আহ্বান অনর্থক—

রামবিলাস নামে কেহ থাকিলেও সে সাড়া দিল না ; কিন্তু গানের যন্ত্রটা যেন আমাদের পশ্চাতে করতালি দিয়া বাজিয়া উঠিল :—

অতুলানন্দ আহার্য্য স্পর্শও করিলেন না।... তিনি কালকার মত গভীর প্রার্থনায় বসিলেন ; কতরাত্রে প্রার্থনা শেষ করিয়া উঠিলেন তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

৮

আরো তিনদিন গেল—

অতুলানন্দের যেমন ধৈর্য্য, তেমনি তিনি নিরভিমানী। অত গা'ল খাইবার পর বাজে লোকে সে-দিক আর মাড়াইত না ; কিন্তু তিনি বহুবার সেখানে গিয়াছেন ... ফলে গানের যন্ত্রটা বন্ধ আছে, লোকসমাগমের সাড়াও পাই না।

রেখা এই বাড়ীতে আসিল—

এবং তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের শেষ রহিল না—

বিলাসিনীর লোকটিও বিমোহিত করিবার কর্কশ আয়োজনটা সে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, তার দৃপ্ত রূপের প্রান্তে যেন একটা ছায়ার প্রান্ত সুরু হইয়া গেছে। সে ঔদ্ধত্য নাই, বৈরাগ্যে বিনয়ে আর শ্লীলতায় সে সর্ব্বত্যাগীর মত, অথচ একটা সুনির্ম্মল আনন্দের লাবণ্য তার মুখেচোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আসিয়া দাঁড়াইল সে বেশ অদঙ্কোচে। বলিল,—আমায় ক্ষমা করুন, আমি মার্জ্জনা চাইছি। বলিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া সে হাত জুড়িল। বলিল,—এতগুলি লোকের সামনে সেদিন আপনাকে অপমান করেছিলাম, তাঁদের সামনেই তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি।—বলিতে বলিতে রেখার চোখে জল দেখা দিল।

অতুলানন্দ বলিলেন,—আমার ক্ষমা যদি শান্তির জন্যে তোমার বাঞ্ছনীয় হয় তবে তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার সে অপরাধ আমি গ্রহণ করি নি।

রেখা এক-পা অগ্রসর হইয়া আসিল ; বলিল,—আমি ভাল হব। বলুন আমায় পায়ে ঠেলবেন না। বলিয়া সে বসিয়া পড়িয়া অতুলানন্দের পায়ের উপর মাথা পাতিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল।

অতুলানন্দ দুইহাতে তার মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যকার অনুতাপ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের আশ্রমে আমি যাব না।

—যদি অনুতাপই হ'য়ে থাকে তবে শাস্তি নিতে ভয় কেন?

রেখার কাতরতা দেখিয়া আমার পেটের ভিতর

অনেকগুলি কথা বজ্ বজ্ করিতে লাগিল, মুখে কেবল বলিলাম,—যেতে যখন ইচ্ছুক নয় তখন জোর করে পাঠালে কি সুফলের আশা করেন?—

—কৱি। শুধু ত্যাগ করে গেলেই মায়ামুক্ত হওয়া যায় না। অনাবিল জীবনের আদর্শ কোনো দিন এর সম্মুখে পড়ে নি; সেখানে তা পাবে। ত্যাগের পরই দ্বিতীয় অবলম্বন একে জোর করেই ধরিয়ে দিতে হবে ... তুলে নিয়ে শূন্যের ওপর ছেড়ে দিলে পুনঃপতন অনিবার্য্য।

চুপ করিয়া গেলাম।

রেখা কেবল কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর অশ্রুজলে তার নিজের পাপের মলিনতা ধৌত হইতে লাগিল নিশ্চয়ই, কিন্তু অতুলানন্দের সঙ্কল্প নরম হইয়া হইল না।—কিন্তু বলিলেন,—যাও। আমি যা বলছি তাই হবে।

রেখা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

... সে রাত্রেও অতুলানন্দ বিপথগামিনীর পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন—

তাঁর গম্ভীর কণ্ঠের গভীর দীর্ঘ শব্দগুলি কাঠের পর্দ্দার ওপারে গম্ গম্ করিতে লাগিল, কখন অশ্রুভারে মন্দীভূত হইয়া কখন প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় সজীব উচ্চ হইয়া।—

অতুলানন্দের চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার। তাঁর বক্তৃতার ওজস্বিতায় সহস্র শ্রোতা মুগ্ধ হইয়া গেছে। ... ব্যাধি, অবনতি, পরাজয়, অকাল-শোক, দেশের এই কঙ্কালসার মূর্ত্তি—আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ... সকল অকল্যাণের মূলে রহিয়াছে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

অতুলানন্দের বক্তৃতার সারাংশ উহাই।

শুনিয়া উপলব্ধি না করিয়া পারি নাই যে, কথাটা ঠিক। ... নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, ইহাও ঠিক। প্রচুর দুর্ব্বলতার ভারে যার দেহ জর্জ্জর তার আত্মার শক্তি আত্মপ্রচার আত্মপ্রতিষ্ঠা দূরে থাক্, আত্মরক্ষা করিতেই অক্ষম। তাই দেশ দ্রুতবেগে অতলের পানে নামিয়া যাইতেছে। কথাটার মর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি ও বললাভ যে কত দুরূহ তাহাও অনুভব করিয়া হঠাৎ হৃদকম্প জাগিয়াছিল।

চাঁদা নগদ আদায় যথেষ্ট হইয়াছে—

এবং প্রতিশ্রুত স্থূল অঙ্কে খাতার মলাটের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে চতুর্থ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বোঝাই হইয়া গেছে।—

অতুলানন্দ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে বলিলেন,—দেখে আসুন ত' স্ত্রীলোকটি কি করছে।

গোয়েন্দাগিরির অনুরোধটা ভাল লাগিল না, তবু গেলাম। এবং দেখিয়া আসিয়া খবর দিলাম,—কি একখানা বই পড়ছে। আপনাকে একবার যেতে বলেছে।

—চলুন যাই। বলিয়া অতুলানন্দ আমাকেও টানিয়া লইলেন।

কিন্তু রেখা আমাকে লক্ষ্যও করিল না; অতুলানন্দকে চেয়ারে বসাইয়া তাঁহার পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িল।

অতুলানন্দ বলিলেন,—তুমি আমায় ডাক্‌বে তা আমি জান্‌তাম। ভগবান্ আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন।

রেখা তাঁর মুখের দিকে তার পদ্মপলাশ চক্ষু দুটি তুলিয়া সকাতরে বলিল,—কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই। তোমাকে যেতেই হবে। তোমার দুঃখ আমাকেও বিঁধবে কিন্তু উপায় নেই। তুমি বোঝ কিনা জানি নে, বল্‌লে বুঝবে কি না জানি নে, কিন্তু এ সত্য অমোঘ যে ভগবানের দরবারে পৌঁছুতে হ'লে মানুষের কাছ থেকে আগে ছাড়পত্র আদায় করা চাই-ই। মানুষ যখন সমস্বরে বলবে, তুমি শুচি—তখনই বুঝতে হবে ভগবানের স্পর্শ আসছে। ভগবানের সঙ্গে সখ্যস্থাপনার যন্ত্রণা সহ্য করবার অর্থ আর কিছুই নয়—মুক্তির অবসর দিয়েছেন বলে তাঁর পায়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ... মানুষের কাছ থেকে মুক্তিপত্র নিতে তাই সুকঠিন সাধনার প্রয়োজন; দৈন্যবোধ আর ক্ষুধার অসহ্য জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।—

অতুলানন্দের কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে কাঁপিতে লাগিল।

রেখা কাঁদিতে লাগিল—

অতুলানন্দ বলিলেন,—হেসে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে তবেই তোমার মুক্তি, আমারও ছুটি। এখন উঠি। বলিয়া

অতুলানন্দ উঠিবার উপক্রম করিতেই রেখা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—বসুন। আমি একা থাকতে পারছি নে।

—আচ্ছা, তবে এস প্রার্থনা করি। বলিয়া অতুলানন্দ ভূমিতেই আসন করিয়া বসিলেন; রেখা অদূরে গললগ্ন-কৃতবাস হইয়া বসিল।... পাছে আমাকেও প্রার্থনায় বসাইয়া দেন এই ভয়েই আমি আল্‌গোছে সরিয়া আসিলাম। ... ঘরে বসিয়াই শুনিতে লাগিলাম—অতুলানন্দ শ্লোকের পর শ্লোক ভগবদ্বাণী আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন।

স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠ বড় মধুর শুনাইতে লাগিল।...

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিলাম, গানের যন্ত্রটা বাজিতেছে।

কিন্তু এ প্রভেদ কোথা হইতে আসিল কে জানে ... আজ কলের গান শুনিয়া মনে হইল, একা পড়িয়া সে এই সঙ্গবিরহন্ত ভয়াবহ নির্জ্জনতা সহ করিতে না পারিয়াই কলের মারফত আর্ত্তনাদ করিতেছে, ... নিজের মনের শূন্যতাকে স্বীকার করিতে সে ভয় পাইতেছে।—

সকালবেলা অতুলানন্দকে দেখিয়া বড় বিস্ময় লাগিল,—তাঁর মুখের জ্যোতিঃ ঈষৎ নিষ্প্রভ হইয়া একটু বিবর্ণতা দেখা দিয়াছে; চোখে অলৌকিক একটা দীপ্তি ... বহুকালের পর অগ্নিকুণ্ডের উপর হইতে যেন ভস্মের স্তূপ অপসৃত হইতেছে; ভাবভঙ্গী চমৎকার—যেন কুলপ্লাবী আনন্দ-চাঞ্চল্য রাখিবার ঠাঁই তাঁর নাই।

সেই দিনই দেখিলাম—একাণ্ড একখানা আর্শি কুলির মাথায় চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ভাবিলাম,—সহস্র পুরুষের সে অতি আপন এই ভাগটা দেখাইবার জন্য এতদিন ধরিয়া তাহার যে প্রাণপণ অনাসক্তির প্রয়োজন হইয়াছে তাহাতেই তাহার বৈরাগ্যের দীক্ষালাভ শেষ হইয়া গিয়াছিল;—এবং সেই কারণেই অতুলানন্দের সামান্য চেষ্টাতেই রমণীর এই বিপুল ত্যাগ এত সত্বর সম্ভব হইয়াছে।... অতুলানন্দের কৃতিত্ব অপেক্ষা রমণীর শক্তিই বেশী।—

আমাদেরও সারাপ্রাণ এই ব্যাপারের শেষ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিল।

... রেখা যখন-তখন আসে; প্রার্থনায় বসিয়া যায়; কাঁদে —

যেন সে বলি —

খড়্গ উদ্যত হইয়াই আছে, কাঁধে পড়িল বলিয়া—

এমনি অসহায় তার ভাব।...

অতুলানন্দকে সে চোখের আড়াল করিতে চাহে না; বলে,—আমায় কে যেন প্রাণপণে পেছনে টান্‌ছে ... আপনি থাকুন।

...সন্ধ্যার পর ভূতের ভয়ে ছোট ছেলে যেমন মায়ের আঁচল ছাড়ে না—তেমনি তার আচরণ; বলে,—তা-ই হোক্, যেথানে খুসী আমায় পাঠিয়ে দেন; আমি নিষ্কৃতি পাই। কবে পাঠিয়ে দেবেন আমায়? বলিয়া ক্লান্তচক্ষে ভিক্ষার্থিনীর মত চাহিয়া থাকে।

—তোমার প্রথম জীবনের চিহ্নগুলি একেবারে সরিয়ে ফেল। তারপরে। বলিয়া অতুলানন্দ ভ্রূভঙ্গী করেন।...

রাত্রে অতুলানন্দ ঘুমান না—

মুখ দিয়া কি সব অস্পষ্ট বাক্য বাহির হইতে থাকে ... কখন গুন্‌গুন্ করিয়া কখন দ্রুতগতি।... যখন-তখন বাহির হইয়া যান্—

চাহিয়া দেখি, সোজা ছুটিয়া চলিয়াছেন ... ঘর্ম্মাক্তদেহে ফিরিয়া আসেন।... বাক্যে ছটা নাই।... বসিয়া থাকিতে থাকিতে চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ... তখনই বসিয়া পড়েন।... সংস্কৃত শ্লোক ভজনের সুরে গাহিয়া যান; মনে হয় যেন কাঁদিতেছেন; চোখে জলও দেখি।—

এবং দুদিন পরেই সকালবেলা হঠাৎ যাহা দেখিলাম তেমনটি আগে কখন দেখি নাই ; পরেও আর যেন দেখিতে না হয়।

মেস্ জুড়িয়া তুমুল একটা কোলাহল উঠিল—

দৌড়াইয়া যাইয়া দেখিলাম—রক্তের স্রোত চারিদিকে ছুটিয়া যাইয়া এখন চাপ বাঁধিয়া শুকাইয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে—

অতুলানন্দ ছিন্নকণ্ঠ—

পাশেই রক্তাক্ত ক্ষুর।

বিভীষিকা, আতঙ্ক আর বিহ্বলতার অন্ত রহিল না ... হাত-পা হিম হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ...

হঠাৎ নজরে পড়িল, রেখা আসিয়া এদিককার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে—পরিত্যক্ত অলঙ্কার আবার গায়ে উঠিয়াছে।

মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়াই সে চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই হারমোনিয়ামটা বাজিয়া উঠিল ... তারপরই গান—

এ হৃদয়হীনতায় খুন চাপে না এমন লোক আছে কি না জানি না!

মার মার শব্দে ছুটিয়া গেলাম—

দরজা ঠেলিতেই গান বন্ধ হইয়া গেল। বলিলাম,—কি হচ্ছে এ-সব এখন? জান না—

—জানি গো জানি। মানুষ নও, তোমরা সব বাঁদর, বাঁদর; সবাই!...

যেন আমার মুখেচোখে থু-থু করিয়া থুথু ছিটাইয়া দিল।

হঠাৎ একটি ঢোক্ গিলিলাম।

বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না।

পাকা ধানের বিদায়

জসীম উদ্‌দীন

আমি যাই রে আমি যাই ;
মঞ্জরী মোর কেঁদে ঝরে যায়,
বেলা নাই—বেলা নাই!

    চৈত্র দিনের ধূসর ধূলায়
    উড়ে এসেছিনু দখিন হাওয়ায়
    চাষীর স্নেহেতে ছেয়েছিনু হায়
        সবুজেতে সব ঠাঁই,

বেলা নাই বেলা নাই!

ধরা জননীর আদুরে দুলাল
মোরা নাচিতাম মাঠে,
মোদের মায়ায় পথিকের চলা
থেমে যেত গেঁয়ো বাঁটে ;

বরষার জলে গা-খানি এলিয়ে
সবুজ আঁচল দিতেম ভাসিয়ে
সাপলার ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে
খেলিয়াছি 'তাই তাই' ;

বেলা নাই, বেলা নাই !

শরতে মোদের কাঁচা বুকগুলো
উঠিয়াছে ফু'লে ফু'লে,
সোনালী আলোর যত মায়া ছিল
ভরিলাম ফুলে ফুলে ।

সহসা দুলিতে কি দেখিনু হায়
কার পা'র মল যেন বেজে যায়
সারা মাঠ ভরি' কে গান শুনায়
বেলা নাই বেলা নাই,

আমি যাই রে আমি যাই !

জানি জানি সই কলমী বধূরা,
কত যে ভাবিবি তোরা,
ওই বুক হ'তে হিঙুল ঝরিয়া
কাঁদাবে সকল ধরা ;

গলে যে মালিকা তোরা পরালি আদরে
ফেলে যেতে হ'ল এই বালুচরে
এ ব্যথারে মোরা ভুলিব কি ক'রে
ভেবে যে বাঁচি না তাই ;
বেলা নাই বেলা নাই !

মটর শুঁটিরা বিদায় বিদায়,
বেলা নাই বেলা নাই !
রহিল এ মাঠ ; তোমরা ইহারে
সবুজে সাজিও ভাই,
প'রে কানে ছুটো হিঙুলের ফুল
সরিষার দোলা ক'রে দিও ভুল,
রাতে জ্বালি রাঙা জোনাকীর ফুল
হাসাইও সব ঠাঁই,
বেলা নাই বেলা নাই !

বাঙ্‌লা সাহিত্যে দেশানুরাগ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্বদেশ, সমাজ ও জাতির সঠিক ছবি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। যখন দেশের জনসাধারণ জাগিয়া উঠে এবং জাতির হৃদয় যখন জ্ঞান ও ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তখন সাহিত্যে তাহার আত্মপ্রকাশ চিরদিন স্বতসিদ্ধ। জাতীয় জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন ঘটে।

আত্মবোধের মধ্য দিয়া সাহিত্যবীরের দেশানুরাগ জন্মে। জাগ্রত দেশের প্রতি প্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতির প্রতি সহৃদয় সংগ্রহভূতি অথবা নিপীড়িত ও অধঃপতিত জাতির জন্য বেদনা সাহিত্যিককে দেশের চিত্র অঙ্কনে প্রবুদ্ধ করে। আপনার প্রতি যাহা প্রীতি তাহাই ভাবের ঔদার্য্যে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া দেশানুরাগে পরিণত হয়।

দেশের জাগরণের ইতিহাস এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্যে নূতন নহে। যাঁহারা প্রতিভাবান তাঁহারা দেশকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে 'দর্শন' করিয়া তাহার ছবি আঁকিতে তাহার প্রতি অনুরাগের ছবি আঁকিতে প্রবুদ্ধ হন, বিশ্বকে আপন ভাবিবার ঔদার্য্যের সমক্ষে প্রতিভাবানের এই দেশানুরাগ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ না থাকিলে জাতীয় প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায় না।

স্বদেশ এবং স্বসাহিত্যের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। মানুষের ভাব সাধারণতঃ আপন মাতৃ-ভাষার মধ্য দিয়াই অন্তর হইতে প্রকাশিত হয়। দেশের বা জাতির ভাব প্রত্যেক মানুষের চিন্তাশক্তির উপর অলক্ষ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আদর্শ এবং ধর্ম্ম সেই দেশের প্রত্যেক কবি, ভাবুক ও দার্শনিককে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই দেশীয় ভাষা অপিচ জাতীয়তার সহিত সাহিত্যের অপরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ প্রতিভা জাগিয়াই দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

রাজনৈতিক কারণে হউক, কিম্বা পূজা-পার্ব্বণ-রীতি বা দেবতাদর্শের সঙ্কীর্ণতার দরুণ হউক, বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য সাময়িক ধর্ম্মের আদর্শে কিঞ্চিৎ অনুপ্রাণিত হইলেও দেশানুরাগের কোন লক্ষণ তাহাতে প্রকটিত নাই। অখ্যাত কবির গান ও পালাগান ছাড়িয়া দিলে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সাহিত্য নূতন ধর্ম্মাদর্শ ও দর্শন লাভ করিয়াছিল কিন্তু কবির জাতীয় প্রতিভা দেশকে জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে নাই। সেইখানে সমাজের ভিতর দিয়া কিম্বা কবি-কল্পনার ভিতর দিয়া দেশকে অনুভব করিবার বা দেশের কথা ভাবিবার কোন প্রয়াস নাই; কেবল ধর্ম্মের বিপ্লবে সমাজের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আছে মাত্র। বলিতে গেলে আমাদের হিন্দুদের কাছে, প্রাচীন সাহিত্যের যুগে, দেশ বা জাতীয়তার কোন ধারণাই ছিল না। 'জন্মভূমি' বলিতে যে নিজের বিস্তৃত দেশ ও একটা উদার, পবিত্র ও প্রফুল্ল ভাব জন্মে, তখন তাহা লোক-ধারণার অতীত ছিল। ধর্ম্মের গোড়ামীকে নিয়া তথাকথিত 'সনাতন' ধর্ম্মই বাঙলার তখনকার প্রতিভাকে জাগ্রত রাখিয়াছিল।

বাঙালী প্রতিভা স্বদেশ এবং জাতিকে (nation) চিনিয়া নিয়া অনুভব করিতে শিখিয়াছে বাঙ্লাদেশে মুসলমানের আধিপত্যের সময় হইতে; অধিকন্তু 'ধর্ম্মভীরু' বাঙালী পরিশেষে ইংরেজের সম্পর্কে আসিয়া ন্যাশনের (nation) মহৎ ভাবকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। বাঙালীর জীবনের উপর বিদেশী প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালী কবির প্রতিভা নিজস্ব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীন বিষয়ের বার বার অবতারণা করিয়া এবং প্রাচীন আর্য্য-আদর্শের ভাব-ধারা প্রবাহিত করাইয়া অভিনবত্বের ও দেশানুরাগের ধারণা হইতে বহু দূরে ছিল। মুসলমানেরাই প্রথমে কাব্যে ধর্ম্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া খাঁটি সাহিত্যরসকে বাঙলায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহার পরে ইংরেজি সাহিত্য ও ভাব বাঙলার সাহিত্যে, সমাজে এবং ধর্ম্মে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবুকমাত্রেই অবগত আছেন।

ইংরেজী সাহিত্যের এই প্রভাবের দ্বারা কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে স্বদেশের অনুভবতা লাভ করিয়া ঐতিহাসিক-সূত্রস্পৃষ্ট উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিভাকে স্বদেশ-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তুলেন। বঙ্কিমের নবজাগ্রত প্রতিভা 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলার' সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'মৃণালিনী' মধ্যেই দেশকে 'দর্শন' করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের চিত্র দান করিলেন। এইখানে নায়ক হেমচন্দ্রের নিজস্ব স্বার্থ ও বাসনা-উৎসর্গের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশানুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই ব্যক্তিগত উৎসর্গ প্রকৃত দেশানুরাগকে প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেশের মহত্ব ও তাহার প্রতি আকর্ষণ, কর্ত্তব্য এবং জাতীয়তার বিস্তার—সত্যিকার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে দেশের প্রতি নায়কের অনুরাগ ও দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গের চিন্তা বা কল্পনার কোন চিত্রই প্রদান করিতে পারেন নাই, 'মৃণালিনী'তে শুধু নিষ্ফল উদ্দেশ্যবিহীন স্বদেশোচ্ছ্বাসেই প্রতিভা নীরব রহিয়াছে। এই নিষ্ফল উচ্ছ্বাস কিন্তু

কবি-প্রতিভার অপরিপূর্ণতা নহে, আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পন্থা খুঁজিবার অসমর্থতা। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বদেশোচ্ছ্বাসের পরেই পারিবারিক আদর্শকে উন্নত করিয়া সমাজ ও দেশকে জাগ্রত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন।

পারিবারিক আদর্শ-দানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ধর্ম্মানুপ্রাণিত স্বদেশ-প্রেমের নিষ্কাম আদর্শকে চিত্রিত করিয়া "আনন্দমঠে" বঙ্কিম-প্রতিভা শীর্ষ স্থানে উপনীত হইয়াছে। এই স্বদেশ-প্রেম পাশ্চাত্যের দেশ-প্রীতি নহে, ইহা নিষ্কাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ও ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে আনন্দমঠের সৃষ্টি করিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণীর' মধ্যে হিন্দুত্বের আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র দেশানুরাগের আভাসকে প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই; এবং বলিতে গেলে এই চিন্তা ও চিত্র "আনন্দমঠের" দীর্ঘ ও গভীর ভাবনার কিঞ্চিৎ প্রভাব এবং ফল, এই ক্ষেত্রদ্বয়ে তাঁহার সাহিত্যপ্রজ্ঞা শুধু নিষ্ফল উচ্ছ্বাসে আত্মশক্তি ব্যয়িত করে নাই, দেশভক্তির আদর্শকে খাড়া করাইয়া একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিতেও সচেষ্ট হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র গানের ভিতর দিয়াও এই মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসকে অমিশ্রিত রাখিয়াছেন, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু দেশানুরাগের পথ-প্রদর্শক নহেন, তিনি তাহাতে চরম উৎকর্ষও লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কবিবর হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভাও জাগ্রত হইয়া প্রথমে দেশপ্রীতিতে সংবদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই প্রীতির স্বাভাবিক প্রথম ফল 'চিন্তা-তরঙ্গিনী'। কবির এই চিন্তা দেশের জন্য, দুর্দ্দশার হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য, কিন্তু এই আন্তরিকতাপূর্ণ চিন্তা একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছে এবং পরিশেষে দেশভক্ত নায়ককে উন্নতির কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া শক্তিহীনতা এবং সমাজ-অবনতির জন্য দুঃখে, ক্ষোভে, রোষে এবং অপমানে স্বদেশ-কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে; কারণ ভারতীয় কবি উপযুক্ত ক্ষেত্র ও আব-হাওয়ার অভাবে সেই স্বদেশের ভাবোচ্ছ্বাস অকারণে ব্যয়িত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কবি-প্রতিভা দেশানুরাগে উৎসাহিত হইয়া 'চিন্তা-তরঙ্গিনী'তে দেশের কথা চিন্তা করিতে গিয়া যখন ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন কল্পনার অলীক স্বপ্নের ভিতর দিয়া হইলেও পাঠান-রাজের বিরুদ্ধে হিন্দু-রাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরব ও আনন্দ লাভ করিবার জন্য তিনি 'বীরবাহুর' মধ্যে চেষ্টিত হইয়া উঠিলেন। বাস্তব ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়া কল্পনার সাহায্যে হিন্দুদের জাতীয়তা ও রাজ্য সৃষ্টি করিয়া হেমচন্দ্র ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। এই জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রীতি-সূচক কাব্যদুইটি ছাড়াও তিনি নানা কবিতা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভারতের জাতীয়তার ও ভারতমাতার উজ্জ্বল চিত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে এই দেশানুরাগ তখন সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও এই জাতীয়তার কল্পনা নূতন এবং হেমচন্দ্রের জাতীয় শিঙ্গার উচ্ছ্বাস কর্ত্তব্য-পন্থার উপযুক্ত খবর দিতে না পারিলেও সেই শিঙ্গারব এখনো স্বদেশভক্তি উদ্দীপিত করিয়া তুলে।

জাতীয় কবি নবীনচন্দ্রের স্বদেশানুরাগে বিশিষ্টতা আছে, স্বদেশ-প্রেম এবং স্বজাতি-প্রীতি তাঁহার প্রতিভাকে সর্ব্বত্র জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং এই জন্যই তিনি কল্পনার রাজা হইলেও অনৈতিহাসিক এবং অতি কল্পিত ঘটনাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া বাস্তবতার ক্ষেত্রে স্বদেশী বীর্য্যের রেখাকে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়া তিনি 'মনের খেদ' মিটাইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিশেষ ভাবে 'পলাশীর যুদ্ধের' মধ্যেই প্রকটিত। এই কাব্যে সিরাজের কাহিনী বা তাঁহার মৃত্যু-বর্ণনা নবীনচন্দ্রের বক্তব্য নহে; দেশবাসীর ভীরুতা এবং ততোধিক মানসিক হীনতার দরুণ কবির অন্তরের অন্তরালে যে বাষ্পোচ্ছ্বাস, তাহাই 'পলাশীর যুদ্ধে' লক্ষ্য করিবার বিষয়। অধিকন্তু মোহনলালের শেষ-বাণীর মধ্যে, তথা বাংলার 'শেষ দিনের' প্রকাশের মধ্যে কবির স্বদেশী মর্ম্মকথা অকপটে ধরা পড়িয়াছে, কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং তথাকথিত ঐতিহাসিক ঘটনা অবিকৃত রাখিয়া এই স্বদেশ-প্রীতির ছবি অঙ্কন কবির প্রধান কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য, তিনি সেবকের জীবনকে ঘৃণা করিতেন।

নবীনচন্দ্রের দেশানুরাগের দ্বিতীয় চিত্র 'রঙ্গমতী'। উহার ঘটনাক্ষেত্রও তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামে। তিনি অনেকস্থলে

তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কাব্যে 'আত্মসম্পর্ক'। 'রঙ্গমতীর' নায়ক স্বয়ং নবীনচন্দ্র। তথায় তিনি জন্মভূমির সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া স্বাধীনভাবে দেশের গান করিয়াছেন এবং তাহার কল্যাণ-কামনা করিয়াছেন। এখানে কল্পনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশকে উন্নত করিবার এবং একটা বিরাট জাতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই 'রঙ্গমতীর' উদ্দেশ্য। এইখানে 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র নিরাশ নায়কের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন নহে, বরং সাফল্য লাভের প্রবল চেষ্টা, হেমচন্দ্রের জাতীয়-সঙ্গীত বাদ দিলে কাব্যের ভিতর দিয়া একজাতি ও একদেশ গঠনের প্রথম অভিলাষ প্রথমে নবীনচন্দ্রেরই মধ্যে জাগিয়াছিল, কিন্তু 'রঙ্গমতীর' মধ্যেও দেশভক্তের উচ্ছ্বাস ও উদ্যম, শুধু কল্পনায় কর্ম্মক্ষম হইয়া, উল্লসিত হইতে পারে নাই, এবং স্বাধীনতার জন্য আকুল কবি দেশ ও জাতির অবনতির এবং অযোগ্যতা দেখিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আবার এই অশ্রু-বিসর্জ্জন কবির দেশভক্তির শেষ পরিণতি নহে; দেশের ধর্ম্ম ও ভগবানের অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশকে উন্নত চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া 'এক জাতি, এক ধর্ম্ম' গঠনের প্রয়াসী হইয়া নবীনচন্দ্র 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' অবতারণা করিয়াছেন, কাজেই এই কাব্যত্রয়ের মধ্যে কবির প্রবল দেশাত্মবোধ জাগ্রত, ধর্ম্ম জাতি ও শিক্ষার উপর যে প্রতিষ্ঠা তাহাই চিরস্থায়ী এবং নবীনচন্দ্রের পরিণত দেশানুরাগ এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রও শেষ বয়সে এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের মধ্যে দেশানুরাগের চিত্রের নিতান্ত অভাব। পাশ্চাত্য জাতি ও ভাবের প্রতি আকর্ষণ তাঁহার স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রতি সহানুভূতিকে জাগিতে দেয় নাই। দেশবাসীর আত্মবোধের প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণের' উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নাটকে একটা বিরাট জাতিবোধের বা দেশজ্ঞানের একটা নিখুঁত চিত্র না থাকিলেও নিপীড়িত জাতির প্রতি শক্তিমানের এই অত্যাচার-কাহিনী দেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্ম-অধিকার বুঝাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে প্রবল দেশাত্মবোধের পরিচয় নাই।

রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক। তিনি আত্মপ্রতিভার সাহায্যে ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, দেশের প্রতি কোন ইঙ্গিত তাঁহার সুস্পষ্ট নাই।

নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও তাঁহার দেশানুরাগ শুধু দুইখানি মাত্র নাটকে (এখন যাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ) বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি সমাজ-সঙ্কীর্ণতার কথা ভাবিয়াছেন, কিন্তু দেশের উন্নতি-বিধানের কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আধুনিক কালে তাঁহার দেশানুরাগ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু ইহা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা স্বীকার্য্য যে, এই স্বদেশ এবং স্বজাতিকে বিশেষ ভাবে চিনাইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁহার প্রতিভা যখন বিশেষ ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল তখন স্বদেশের বা রাজস্থানের বীর-ইতিহাস, তাঁহাদের বীর্য্যপূর্ণ প্রতিশোধ-স্পৃহা, কুলগর্ব্ব, অক্লান্ত ধর্ম্মযুদ্ধ এবং আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রাচীন ও মহান চিত্র তিনি তাঁহার নাটকে আঁকিয়া দেশের জনসাধারণের স্বদেশ-ভক্তির স্পৃহাকে যথেষ্ট ভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণ যে দেশানুরাগ ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত শিক্ষিত ও পরিমিত মহলে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীত এবং প্রাচীন ভারতের বীরগাথা এখনো প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মানুষকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। তিনি জনসাধারণের স্বদেশ-প্রীতিকে মাত্র জাগাইয়া তুলিয়াছেন এমন নহে, নানা ভাব-ভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিত এবং গানের মধ্য দিয়া তিনি স্বদেশের জাতীয় ব্যাধি এবং তাহার প্রতিকার নিরূপণ করিয়া জাতীয় জীবন-সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে সাহিত্য-রসের যাহা অভাব, তাহা অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত। তিনি শুধু আনন্দ ও রস-বিধানের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে যান নাই, তিনি ঠিক সময়ে বুভুক্ষু ও তৃষ্ণার্ত্ত দেশবাসীকে অন্ন ও জল দান করিয়াছেন। দেশকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জাগাইয়া

তুলিবার প্রধান ক্ষেত্র অভিনয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই অধঃপতিত জাতির লোক-শিক্ষক হইয়া নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে 'তারাবাঈ', 'দুর্গাদাস', 'রাণা-প্রতাপ', 'মেবার পতন' প্রভৃতির মত জাতীয় ভাব-উদ্দীপক চিত্র দান করিয়াছেন; তাঁহার ঋণ ভারতের জাতীয় সাহিত্যে অপরিশোধনীয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভাও প্রথমেই জাগরণের পথে 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্যের' কীর্ত্তিগাথা শুনাইয়া মানুষের সদ্য-জাগ্রত চিত্তকে বিস্মিত ও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল যে কবিত্বশক্তি, ক্ষমতা এবং প্রেরণা লইয়া দেশানুরাগের সফল পরিচয় দিয়াছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেক দিক দিয়া তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশী-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছোট-বড় যে অনেক কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।*

ছন্দের কথা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

সব জিনিষের ভিতর একটা শ্রুতিমধুরত্ব আছে। মানুষের কথা-বার্ত্তায় চাল-চলনে, হাব-ভাবের মধ্যেও সেই শ্রুতিমধুরত্বের আভাস পাওয়া যায়। সঙ্গীতকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর কর্ত্তে হ'লে যেমন সুর-লয়ের সঙ্গে তালের দরকার, তেমনি সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের মধ্যে সুর, লয় এবং তালের প্রয়োজন আছে। সৃষ্টির বিকাশ মধ্যে সুর, লয় এবং তালের সংমিশ্রণে যে মধুরত্ব প্রকাশ পায় তার নাম ছন্দ-ব্রহ্ম। সপ্তকের নাদের ভিতর থেকে যে আনন্দ মাধুর্য্য প্রকাশ পেয়েছে তার নাম সঙ্গীত। আর মানুষের-হৃদয়-সপ্তকের মধ্যে থেকে যে আনন্দ-মধুরত্ব বিকশিত হচ্ছে তার নাম কবিত্ব—রূপের মূর্চ্ছনা তার, কবিতা ও কাব্য। রসবিশিষ্ট বাক্যই কাব্য,—গদ্য এবং পদ্য দুই-ই হতে পারে; কারণ, রস সর্ব্বদাই ছন্দোময়।

কবিতামাত্রেই তার ছন্দ আছে; কারণ, ভাবের সঙ্গে ছন্দ মিশ খেয়েই কবিতা তৈরী হয়েছে। ছন্দের উপর কবিতার শ্রুতিমাধুর্য্য নির্ভর করে। সেই জন্য কবিতার তাল হ'চ্ছে তার ছন্দ, সুর হচ্ছে আবৃত্তির ধারা আর লয় তার তরঙ্গায়িত গতির পথ-নির্দ্দেশক।

ছন্দ বুঝতে হ'লে প্রথম দু'টো জিনিষ জানা দরকার। একটা হচ্ছে যতি আর একটা মাত্রা। যতি কি?— নির্দ্দিষ্ট মাত্রাবিশিষ্ট বিরাম-স্থান। যে-কোন কবিতার যে-কোন লাইন পড়বার সময় আপনা থেকেই একটা থামবার ইচ্ছা, অর্থাৎ বিরামের ঝোঁক আসে। এবং সেই বিরাম-স্থানে যতি পড়লো এইরূপ বলা হয়; তবে, প্রথমেই জানা দরকার এই যতিগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রাপ্রসূত কি না, কারণ মাত্রা ঠিক না থাকলে বিরাম-স্থানে যতি পড়ে না।

* জীবিত সাহিত্যিকগণের স্বদেশভক্তির আলোচনা সঙ্গত নহে বিবেচনায় তাহা করা হইল না।

সমছন্দোবন্ধ, অর্থাৎ যতি-যুক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতার এই নিয়ম। যথা :—

অঙ্গে অঙ্গ | বাঁধিছে রঙ্গ | পাশে
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা,
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়া উঠিছে | হাসি
নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে যে সমস্ত যতি দেওয়া হ'য়েছে, সেগুলি সঠিক মাত্রাপ্রসূত। প্রতি তরঙ্গ অর্থাৎ পাদে ছটি ক'রে মাত্রা আছে; কারণ যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণের দু'মাত্রা ধরাই নিয়ম। সঠিক মাত্রাবিশিষ্ট তরঙ্গ-খণ্ডের নাম পাদ। এখানে যতি পতনের কোন ভুল নেই। আর একটা দেখা যাক :—

একাকিনী | শোকাকুলা | অশোক কাননে |
কাঁদেন | রাঘববাঞ্ছা | আঁধার কুটিরে |
নীরবে | ...

—মাইকেল মধুসূদন

এ স্থলে যে সমস্ত যতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো সঠিক মাত্রাপ্রসূত নয়। "একাকিনী," "শোকাকুলা," "অশোক-কাননে" প্রভৃতির পর আপন ইচ্ছায় থামতে হ'লেও এখানে প্রতি পাদে সমান মাত্রা না থাকার দরুণ যতি পতন হ'য়েছে। যতিহীন ছন্দে এই রকম পতন গ্রহণীয়। এই দৃষ্টান্তটি মাইকেলের অসম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এখন যতি কি ভালো বুঝতে হ'লে মাত্রা কি জানা দরকার।

অসম সম অর্থাৎ যতিহীন বা যতিযুক্ত যে-কোন ছন্দের যে-কোন কবিতার বিরাম-স্থল ভাগ ক'রে খুব ধীরে ধীরে পড়বার চেষ্টা কল্লেই মাত্রা কি বোঝা সহজ হবে। যেমন :—

জীবনে | যত পূজা | হ'ল না | সারা,
জানি হে | জানি তাও | হয় নি | হারা।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে "জীবনে", "যত পূজা" "হল না" ইত্যাদির পর আপন ইচ্ছাতেই থামতে হয়। "জীবনে" শব্দটি খুব ধীরে ধীরে পড়লে—"জী-ব-নে" এইরূপ দাঁড়ায়। এই যে "জীবনে" শব্দটি তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো, তা'থেকে বোঝা গেল কি?—না, এতে তিনটি মাত্রা আছে! "যত পূজা" শব্দটি খুব ধীরে ধীরে পড়লে—'য-ত-পূ-জা' এইরূপ দাঁড়ায়। এখানেও চারটি মাত্রা পাওয়া গেল। তা'হ'লে প্রতি লাইনে বারটি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে।

এখন এই মাত্রা কতগুলো হ'লো তা' গোণবার প্রণালী, অনেকটা কবিতা পড়তেই বোঝা যায়। যেমন :—

আজ শ্মশানে | বহ্নিশিখা | অভ্রভেদি | তীব্র জ্বালা!
আজ শ্মশানে | পড়ছে ঝরে | উল্কাতরল | জ্বালার মালা॥

—সত্যেন দত্ত

এখানে "আজ শ্মশানে" শব্দটির পর একটা যতি পড়েছে দেখা যাচ্ছে। এখন এর মাত্রা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে হ'লে যদি খুব ধীরে ধীরে এইরূপ পড়ি :—

আ—জ—শ্ম—শা—নে

তা'হ'লে পাচ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে কবিতাটি পড়তে আমাদের ঝোঁক আসে এইরূপ :—

আজ—শ্ম—শা—নে

তাই এর চারটে মাত্রা হ'লো। তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে এর প্রথম লাইনে ৪×৪=১৬টি মাত্রা আছে; কারণ

প্রতি পাদে চারিটি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্চে। এখন যতি ও মাত্রা কাকে বলে ও তারা কি জিনিষ তা' বেশ বোঝা গেল। তারপর ছন্দ নিয়ে যত ঘাঁটা যাবে ততই মাত্রা ও যতিজ্ঞান বাড়তে থাকবে।

সাধারণত বাঙলা ছন্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—অক্ষরমাত্রিক, হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ও স্বরমাত্রিক। এই তিন জাতীয় ছন্দের মধ্যে আবার অনেক রকম বর্ণ-বিভাগ আছে, তা'দের কথা পর পর বলছি।

যে সব কবিতা'র ছন্দ অক্ষর গুণে গুণে বের কর্ত্তে হয় তাদের অক্ষরমাত্রিক ছন্দ বলে। অক্ষর-মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক অক্ষরে একটি ক'রে মাত্রা ধর্ত্তে হয়। যুক্তাক্ষর কিম্বা ব্যাঞ্জনবর্ণ ক্ষ, জ্ঞ, ন্, ত্ ইত্যাদি প্রত্যেকেরি একটি ক'রে মাত্রা আছে। যেমনঃ—

বসন্ত কুসুমরাজি | সুরভি শোভন,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ | বহে সমীরণ?

—দ্বিজেন্দ্রলাল

এই দৃষ্টান্তটি পয়ার ছন্দের, আট মাত্রার পর যতি প'ড়েছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রত্যেক লাইনে চোদ্দট ক'রে মাত্রা আছে। এই হচ্ছে অক্ষরমাত্রিক ছন্দের সাধারণ মাত্রা গণনাপ্রণালী। হেমচন্দ্রের ভিতর এই অক্ষরমাত্রিক ছন্দট অনেক প্রকার নূতন আকার ধারণ ক'রেছে দেখা যায়। তিনি ত্রিপদী, চৌপদী আর পয়ার এই তিনটি ছন্দকে একসঙ্গে ব্যবহার করে একটি অভিনব পন্থায় কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে প্রত্যেক লাইন হ'চ্ছে এক একটি পাদ, যদিও তাদের আট মাত্রার পর প্রায়ই যতি পড়তে দেখা যায়। যথা:—

কোথায় লুকিয়ে ছিলে | নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি না পাই দেখিতে পাখী
আবার শুনিতে পাই | সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে | তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখাল বল এ সঙ্গীত নিরমল
আমার মনের কথা | জানিলি কোথায়?
ডাকরে আবার ডাক | পরাণ জুড়ায়॥

—হেমচন্দ্র

এটা হচ্ছে হেমচন্দ্রের সপ্তপদী ছন্দের উদাহরণ। তিনি চৌপদী থেকে নবপদী পর্য্যন্ত এইরকম অভিনব পন্থায় কবিতা রচনা করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মোটামুটি সম অর্থাৎ যতিযুক্ত অক্ষরমাত্রিক ছন্দের কথা। সবছন্দ সর্ব্বদাই মিত্রাক্ষর। এ ছাড়া অক্ষরমাত্রিক ছন্দ যতিহীনও হ'তে পারে।

যতিহীন অক্ষরমাত্রিক ছন্দ আছে দু'রকম। এক রকম হচ্ছে মিত্রাক্ষর, আর একরকম অমিত্রাক্ষর। মিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতার পংক্তি কোন সময় সঠিক মাত্রাবিশিষ্ট হয় আবার কোন সময় হয়ও না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বেলায় ঠিক এই নিয়ম, অর্থাৎ পংক্তিতে কোন সময় মাত্রার ঠিক থাকে আবার থাকেও না।

হ্রস্বদীর্ঘের মাত্রা গুণে যে কবিতার ছন্দ বের কর্ত্তে হয় তাকে হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ছন্দ বলে। হ্রস্বদীর্ঘ অর্থাৎ স্বরের গুরুলঘু উচ্চারণের উপর যে সব মাত্রা পাওয়া যায় তা'দের অব্যবচ্ছেদ করে নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে যতি ফেলে হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ছন্দ ঠিক ক'র্ত্তে হয়। আমাদের বৈষ্ণব কবিদের ভিতর খাঁটি সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ছন্দের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। তারপর ভারতচন্দ্রের মধ্যেও তার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখতে পাই।

খাঁটি সংস্কৃতের মত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ আমরা বাংলাতে কস্মিনকালেও করি না। সেইজন্য হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ছন্দের কবিতার যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে দু'মাত্রা ধরা হয়, আর তাছাড়া যে সমস্ত দীর্ঘস্বরের আপনা থেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ আসে তাদের দু'মাত্রা এবং বাদ বাকি সবেরই একমাত্রা। যথা:—

মাঘের বুকে | সকৌতুকে | কে আজি এলো | তাহা,
বুঝিতে পার | তুমি?

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে "কৌতুকে শব্দটিতে পাঁচটি মাত্রা আছে। কারণ 'ঔ' কার যুক্ত "কৌ" বর্ণটিতে দীর্ঘ উচ্চারণ প্রকাশ পাচ্ছে বলে এর ছুটো মাত্রা ধর্ত্তে হবে। ফলকথা, বাঙলাতে 'ঐ' কার আর 'ঔ' কার এই ছু'টোর আমরা সব সময়েই দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি, তাই এদের ছুটো মাত্রা আর অন্যান্য দীর্ঘ স্বরের একমাত্রা ধরা হয়। তা'হলে উদাহরণটির প্রতিপাদে পাঁচটি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। আর একটা দেখা যাক্ :—

গাঁথিছ ছন্দ | হ্রস্বদীর্ঘ
মাথা ও মুণ্ডু | ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাহে | হস্তী অশ্ব
না মিলে শস্ত | কণা।
—রবীন্দ্রনাথ

এস্থানে "ছন্দ", "দীর্ঘ", "মুণ্ডু", ইত্যাদি শব্দে "ন্দ", "র্ঘ", "ণ্ডু" যুক্তাক্ষর যোগ থাকার দরুণ তাদের পূর্ব্ব বর্ণ "ছ", "দী", "মু" প্রভৃতির ছুটো করে মাত্রা ধর্ত্তে হবে। তাহলে এখানে প্রতি পাদে ছু'টি ক'রে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত এই হচ্ছে বাঙলা হ্রস্বদীর্ঘমাত্রিক ছন্দের ছন্দ ও মাত্রা গণনা-প্রণালী। এইটুকু জানা থাকলেই এই ছন্দের যে-কোন কবিতা আবৃত্তি কর্ত্তে বা লিখতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

স্বরের উপর যার মাত্রা নির্ভর করে তাকে স্বরমাত্রিক ছন্দ বলে। স্বরমাত্রিক ছন্দের মাত্রা স্বর গুণে গুণে বের কর্ত্তে হয়। যথা :—

চটুল চোখে | তারার মত | চায় ;
হাত লোভানো | মন ভুলানো | তায়
ঘাটের ধারে | ছুট্টে ছিলাম | হায়।
—সত্যেন দত্ত

এখানে প্রথম লাইনের প্রথম পাদটি ধরে দেখা যাক্। "চটুল চোখে" শব্দটিতে কটা মাত্রা আছে? আমরা সাধারণত পড়বার সময় 'চ-টুল-চো-খে' এইরূপ পড়ি। তা'হ'লে এখানে 'অ-উ-ও-এ এই চারটি স্বরমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। "তারার মত" শব্দটিকে এই প্রকার বিশ্লেষণ কল্লে 'আ-আ-অ-অ' এই চারটি স্বরমাত্রা পাওয়া যায়। তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রত্যেক পাদে চারটি ক'রে স্বরমাত্রা আছে। "চায়", "তায়", "হায়" এদের একটি স্বতন্ত্র পাদ ব'লে গণ্য করা হয় না; কারণ, পূর্ণ-যতির পর এইরূপ অসম্পূর্ণ পাদকে অপূর্ণ পাদ বলা হয়। এই দৃষ্টান্তটি চতুস্বরমাত্রিক ত্রিপদীর উদাহারণ। আর একটা, যথা :—

ছেলে ঘুমালো | পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো | দেশে।
বুলবুলিতে | ধান খেয়েছে
খাজ্‌না দিব | কিসে॥
—ঘুম পাড়ানো ছড়া

এখানেও প্রত্যেক পাদে চারটি ক'রে স্বরমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে, কেবল, "ছেলে ঘুমালো", "পাড়া জুড়ালো" শব্দ ছুটিতে একটা ক'রে স্বরমাত্রার আধিক্য দেখা যাচ্ছে; কিন্তু আসলে এখানে একটিও স্বরমাত্রা বেশী হয় নি; কারণ, এই দৃষ্টান্তটির লয় অনুসারে প্রতি পাদের মাত্রা চারটি ক'রে। "ছেলে ঘুমালো", "পাড়া জুড়ালো" শব্দ ছু'টি আবৃত্তি কর্ব্বার সময় "ঘুও মা", "জু ও ড়া" এই চারটি স্বরান্ত বর্ণকে "ঘুমা" "জুড়া" উচ্চারণ ক'রে আমরা শেষবর্ণ 'মা' 'ড়া'-র স্বরের উচ্চারণ করি। অতএব এখানে "ঘুমা", "জুড়া" শব্দ ছু'টিতে ছু'টি স্বর আ, আ পাওয়া যাচ্ছে—চারটি নয়। তা'হলে এখন বেশ বোঝা গেল, লয় ঠিক থাক্‌লে এইপ্রকার ছন্দপতন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়; কারণ, লয় ঠিক থাক্‌লে আবৃত্তি কর্ব্বার সময় কখনও মুখে বাজে না।

অধুনা স্বরমাত্রিক ছন্দের লয় ধ'রে অনেক কবিতা লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ খাঁটি স্বরমাত্রিক ছন্দ অনুসারে

কবিতা না লিখে তাঁদের যে ছন্দের যে রকম গতি বা লয় ঠিক সেই অনুসারে মাত্রা ও যতি ফেলে অভিনব লয়বিশিষ্ট স্বরমাত্রিক ছন্দে কবিতা লেখা হয়। সেজন্য এসব ছন্দের কবিতার লয়ের ওপর যে সব স্বরের পৃথক ও শুদ্ধ উচ্চারণ আসে তাদের একটা মাত্রা ধর্ত্তে হয়। সাধারণত এই ধরণের সমস্ত অভিনব লয়বিশিষ্ট স্বরমাত্রিক ছন্দের কবিতাতে লয় অনুসারে দু'মাত্রায় পর পর যতি পড়তে দেখা যায়। যথা :—

শোন সখী | গায় কারা | আজ রাতে | গুজরাতী | গরবা !
খঞ্জন | নর্ত্তন | হিল্লোল | গর্ভা !
প্রিয়া গ | -ৰ্ব্বের হিয়া ক | -ন্দর্পের
হার মানে | ঠুংরি কা | -হার বা !
দুনিয়ার | আদরের ফুর্ত্তির | আতরের
মনোহারী | বেলোয়ারী | কারবা !

—সত্যেন দত্ত

এটা গুজরাটের গরবার সুরের লয় ধ'রে লেখা হ'য়েছে। এখানে প্রত্যেক পাদে দু'টো করে মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
—শোন্-সখী | গায়-কারা | আজ-রাতে | গুজ-রাতী |
১ ২
গর-বা | ইত্যাদি।

আবার অনেক সময় লয়টা অভিনব হ'লেও মাত্রা ঠিক খাঁটি স্বরমাত্রিক ছন্দের মতনই থাকে। সেখানে লয়টা যদিও নূতন আকার ধারণ ক'রেছে, তাহ'লেও মাত্রার বেলায় স্বরমাত্রিক ছন্দের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। যেমন :—

পালকী | দোলে
ঢেউয়ের | নাড়ায় !
ঢেউয়ে | দোলে
অঙ্গ | দোলে !
মেঠো | জাহাজ
সাম্‌নে | বাড়ে—
ছয় বে | -হারার
চরণ- | দাঁড়ে।

—সত্যেন দত্ত

এই দৃষ্টান্তটির লয় বাস্তবিকই অভিনব।—যখন পালকী বাহকরা পালকি নিয়ে চলে, তখন একটা দোদুল নৃত্য সৃষ্টি হ'য়ে ঠিক তালে তালে চলতে থাকে ; আর সেইজন্য পালকী বাহকরা প্রত্যেক তাল সমাপ্তিতে 'হেঁইও' করে একটা ডাক ছাড়ে। এই যে নৃত্যচপল দোদুল দুলকি তাল তারই লয়ে এই ছন্দ তৈরী হ'য়েছে। এখানে লয়টা অভিনব হ'লেও মাত্রাগুলি খাঁটি স্বরমাত্রিক অনুসারে গুণে যতি ফেলা হ'য়েছে। আর একটা যথা —

পিছল পথে | নাইকো বাধা
পিছনে টান | নাইকো মোটে।
পাগ্‌লা ঝোরার | পাগল নাটে
নিত্য নূতন | সঙ্গী জোটে॥
লাফিয়ে পড়ে | ধাপে ধাপে
ঝাঁপিয়ে পড়ে | উচ্চ হ'তে।
চড় চড়িয়ে | পাহাড় ফেড়ে
নৃত্য করে | মত্ত স্রোতে॥

—সত্যেন দত্ত

এখানকার লয় হচ্ছে যখন, মন কোনো অসম্ভব কাজ কর্ব্বার জন্য নেচে ওঠে তখন, মনে একটা অসীম, অসম্ভব, রুদ্র জোর-ছুটানো নৃত্যচপল পুলক আসে; আর সেই পুলকে দেহটাও সাড়া দেয়। এরই যে লয় সেই লয় নিয়েই এই ছন্দ রচনা করা হ'য়েছে। এখানকার মাত্রা ও যতি স্বরমাত্রিক অনুসারে বিভাগ করা হ'য়েছে; শুধু লয়টাই অভিনব।

এই হচ্ছে মোটামুট বাংলা ছন্দের তালিকা। এদের ভিতরও আবার অনেক রকম বর্ণবিভাগ আছে, তাদের কথা পরে আলোচনা করা যাবে তবে, এই সব ছন্দের কল-কৌশল জানা থাকলে অন্য যে-কোন বর্ণের ছন্দকে আপনাথেকেই বিশ্লেষণ করা যায়; কারণ অন্য সব ছন্দের মূলভিত্তি এই কয়েকটি ছন্দের ওপর।

মহাকাল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এলো রাত্রি অন্ধকার বিথারিয়া ঘন বনতলে।
অসহ মৌনতাভারে গ্রহতারা যেন দলে-দলে
থমকি' রহিল শূন্যে; প্রহরেরা স্থির গতিহীন;
একটি রাত্রির বুকে ডুবিয়াছে চিররাত্রিদিন।

নাহি ধ্বনি ক্ষীণতম,—পাখীদের পক্ষ-বিধূনন,—
বনভূমি রুদ্ধবাক্, সভয়ে হেরিছে দুঃস্বপন।
ঊর্ম্মিহীন বায়ুস্তর—স্তব্ধ যেন প্রচণ্ড আবেগে,
সমুদ্র থেমেছে যেন আসন্ন ঝঞ্চার কালোমেঘে।

দিগ্ব্যাপিনী এ কি মূর্ত্তি! সমাস্তৃত দীর্ঘ জটাজাল
মুহূর্ত্তে সংহত করি' আসিলে কি তুমি মহাকাল?

—সহস্রের অশ্রুজল জমা হ'য়ে হয়েছে পাষাণ,
পঞ্জরাস্থি গড়িয়াছে যুগেযুগে প্রস্তর-সোপান,
তারি পরে দাঁড়াইয়া কোটি-জীব-কঙ্কাল-বেদীতে
হেরিছ কি অন্ধকারে রক্তসিন্ধু বেগে তরঙ্গিতে?

ছিন্নহৃদি মানবের! বক্ষভাঙা দীর্ণ হাহাকারে
চাহে স্থির নীলাকাশে,—স্তম্ভিত প্রহরী সারে-সারে

বাক্যহীন সারারাত্রি,—নিশীথের স্তব্ধতা ঘনায় !
সান্ত্বনা আনে না কেহ, আঁখি তুলে কেহ নাহি চায়।

মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝা জাগে,—অসহন অনাবৃত নীল
আবরিয়া কৃষ্ণাম্বরে, তমিস্রায় ডুবায়ে নিখিল।
উচ্ছলিয়া ওঠে নদী। কম্পমান বনস্পতি-শিরে
রোষ-কষায়িত-আঁখি ভীম বজ্র গরজে গম্ভীরে।
কঙ্কাল-করোটি-রন্ধ্রে জাগে তীব্র হাহাকার-গান !
কুৎসিত অস্থির মালা ! কোথা রূপ, কোথা দেহ, প্রাণ ?

…মুমূর্ষু সন্তান-শিরে নিষ্পলক আঁখি করি' নত
চেতনে চেতনাহারা স্পন্দহীনা পাষাণীর মত,
একাকিনী বসি' মাতা, মৃত্যুচ্ছায়া ঘনায় কুটীরে,
অন্ধকার অমারাত্রি,—বৃষ্টিবায়ু গরজিয়া ফিরে,
জলধারা পশে আসি' সন্তানের শয়ন-শিথানে
মানে না মায়ের বাধা, ফিরে ফিরে আসে শয্যাপানে,
—দুলিয়া কাঁপিয়া ওঠে জীর্ণগৃহ সুতীব্র পবনে,
নিবে যায় গৃহদীপ, গর্জ্জে মেঘ বিদারি' গগনে !
ক্ষীণ দু'টি বাহুপাশে শিহরিয়া সন্তানে জড়ায়।
—পদধ্বনি অন্ধকারে ! মৃত্যুদূত এলো বুঝি হায় !

এ কি লীলা চিরন্তনী ! নিয়তির এ কি নিষ্ঠুরতা !
বোঝে না মমতা ব্যথা শোনে না করুণ কাতরতা,
জানে না মাটির বুকে প্রতি তরু শিকড় জড়ায়,
ছিঁড়ে লও—তবু তার দৃঢ় মূল কিছুতে না যায়।
সহস্র পুরুষ হ'তে এক রক্ত এসেছে বহিয়া,
গাহিয়া ব্যথার গান দেহে-দেহে চলে তরঙ্গিয়া।
সন্তানে গড়েছে মাতা আপনারি বক্ষ-রক্ত হ'তে
পঙ্ক যথা সৃজি' পদ্মে বক্ষ হতে তুলিছে আলোতে।
নিয়তি ছিঁড়িছে তারে।— নিঃশব্দে হেরিছ মহাকাল !
শোকাচ্ছন্ন রাত্রি ঘেরি' অন্ধকার তব জটাজাল।

সৃষ্টির প্রভাতে নাকি যুগান্তের ভেদিয়া তিমির
উঠেছিল সূর্য্যালোক, সিন্ধুবক্ষে দুলেছিল নীর,
স্তব্ধতার বক্ষে নাকি জেগেছিল কূজনগুঞ্জন,
কলরব, কোলাহল—প্লাবি' এই মর্ত্ত্যের অঙ্গন ?

কোথা আলো ? এ তো শুধু ক্ষণিকের আলোর স্বপন !
মৃত্যুচ্ছায়া ঘিরে' আছে জীবনের প্রতি মুগ্ধ ক্ষণ,
দু'দিনের কলরব। হাসি খেলা মুহূর্ত্তে ফুরায়।
রহে না সে—তপ্তবক্ষ বক্ষে যারে রাখিলে জুড়ায়।

স্নেহহীন মহাকাল ! ছিন্নমুণ্ডে খেলিছে নিয়তি !
মানবের ক্ষুদ্র বুকে বেদনার নাহিক বিরতি !
কামনার অগ্নিসিন্ধু প্রেমোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিয়া উঠি'
বক্ষে যায় ভেঙে চুরে, নিরাশ্বাসে পড়ে লুটি' লুটি'।
চূর্ণ হয়ে পঞ্জরাস্থি মিশে যায় পদধূলি সনে
উড়ে যায় দূরান্তরে নিশীথের শ্মশান-পবনে।

মিলনের মধুরাত্রে মুছে যায় সিঁথির সিন্দুর,
দৈন্যের ক্রন্দন-মাঝে পুত্রহীনা কাঁদে শোকাতুর,—
যুগ-যুগান্তর বসি' বেদনার চিরন্তন গান
শুনিতেছ মহাকাল !—দিকে দিকে চূর্ণ যত প্রাণ।

—আজিকার অন্ধকারে হেরিতেছি তোমারি মুরতি
নিঃশব্দ গম্ভীর মৌন, বিশ্ব যেন লভেছে বিরতি,
নাহি ঘুরে গ্রহচক্র, কম্পহীন অনন্ত অম্বর,
শ্মশানের নিস্তব্ধতা ঘিরিয়াছে বিশ্ব-চরাচর।
বিপুল জগৎ আজি মুহূর্ত্তেকে থেমেছে থমকি',
ঘনকৃষ্ণ মৃত্যুস্রোতে তীব্রগতি সহসা চমকি'
চাহিয়াছে ঊর্দ্ধপানে,—আরো ঘোর তমিস্র বিশাল।
মহাকাল মেলিয়াছে পুঞ্জিত সুদীর্ঘ জটাজাল।

———